মাসিক

আল-আবরার

The Monthly AL-ABRAR

الأبرار

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৪, সংখ্যা-০৬

জুলাই ২০১৫ ইং, রমাজান-শাওয়াল ১৪৩৬ হি., আষাঢ় ১৪২২ বাং

رمضان–شوال ١٤٣٦ﻫ يوليو ٢٠١٥م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সার্কুলেশন ম্যানেজার

হাফেজ আখতার হোসাইন

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪০২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.com
www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২

পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :............................... ৩

পবিত্র সুন্নাহ থেকে :

'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৭ ..... ৪

দরসে ফিকহ :

যাকাত : আহকাম ও মাসায়েল......................... ৮

মুফতী শাহেদ রহমানী

হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ১৪

মাওয়ায়েযে ফকীহুল মিল্লাত :

নেয়ামতের হিসাব দিতে হবে.......................... ১৫

"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ :

ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের দলিল ১৭

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক

শবেকদর, সাদকাতুল ফিতর, ঈদ ফাজায়েল ও মাসায়েল ২৩

মুফতী নুর মুহাম্মদ

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১৮........ ২৭

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

তারাবীতে কোরআন খতমের বিনিময় ৩১

মুফতী শরীফুল আজম

মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ১৪....... ৩৮

মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪৪

মলফূজাতে আকাবের ৪৭

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক: ০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১১৯১৯১১২২৪

সম্পাদকীয়

সুন্নাহ মতে মাহে মোবারক উদ্‌যাপন : মারকাযের ভূমিকা

বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় মহা বরকতময় মাহে রমাজান উপস্থিত হলে সরদারে দু'আলম রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দৈনন্দিন জীবনে বিশেষভাবে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হতো। এই মাস মহা বরকতময় মহাসাধনার মাস ঘোষণা দিয়ে নিজেই কোমর বেঁধে নেমে যেতেন মহামহিম আল্লাহর দরবারে। নামায, রোযা, ইবাদাত, তাযকিয়া, দু'আ, ইস্তিগফার, কোরআন তেলাওয়াত, ই'তিকাফ তথা সর্বক্ষেত্রে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করত নবীজি (সা.)-এর পরিবারে এবং তাঁর সাথীসঙ্গী সাহাবায়ে কেরামের জামা'আতে। সে সূত্রে সমস্ত আকাবেরীনে উম্মত রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের প্রদর্শিত পন্থায় যথাসাধ্য চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে মাহে মোবারককে উদ্‌যাপনের চেষ্টায় ব্রত হতেন।

উপমহাদেশের শীর্ষ মুরব্বি হযরত ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (দা.বা.) আজ থেকে ২৫ বছর পূর্বে মুসলিম উম্মাহে সহীহ সুন্নাতে নববী প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত 'মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বসুন্ধরা ঢাকা' প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটি আমল কিভাবে সুন্নাহের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এর জন্য সর্বোচ্চ গবেষণারও ব্যবস্থা করেন তিনি। অত্র প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ-প্রতিবেশের ওপর সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান করে এই প্রতিষ্ঠানকে রূপ দেন নববী সুন্নাহর একটি বেগবান ঝর্ণাধারা হিসেবে।

বছরের অন্যান্য সময় তো আছেই বিশেষ করে রমাজানের আগমনে একটি স্বতন্ত্র আঙ্গিকেই সাজিয়ে আসছিলেন এই রূহানী বাগানকে। যখন প্রায় সকলের চিন্তাধারা হলো 'রমাজান মানে ছুটি' তখন এই মহাপুরুষের চিন্তাধারা হলো রমাজনের ছুটি মানে দুনিয়াবী সকল কাজকে ছুটি দিয়ে সাধনার অক্লান্ত যাত্রার মহামূল্যবান সময় এই মাহে রমাজান। আর মাদরাসা অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো নিছক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই নয় বরং দ্বীনি ইলম অর্জন ও সুন্নাতে নববী চর্চার পবিত্র স্থান-ইবাদতগাহ। সুতরাং মাদরাসা-মসজিদকেই মূলত সর্বোত্তমভাবে রমাজান উদ্‌যাপনের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করতে হবে।

আল্লাহর অশেষ রহমত নববী সুন্নাতের আদলে যৌথভাবে রমাজান উদ্‌যাপনের এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হন তিনি। শত শত উলামা ও তালাবা রমাজানকে উপলক্ষ করে জমায়েত হন মারকাযে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা বড় বড় উলামায়ে কেরামের জমাআত ৪০ দিন ৩০ দিন, ১৫ দিন এবং ১০ দিনের ই'তিকাফ করে মহাসাধনায় মত্ত হন। শত শত তালেবে ইলম তাসহীহে কোরআন, তাদরীবে নাহু, সরফ এবং ফেরাকে বাতেলার পাশাপাশি যৌথ এবং একাকী সকল ইবাদাতে ব্যস্ত থাকেন। এ যেন এক মাদানী নূরানী পরিবেশ।

দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা এই ধারাবাহিকতার একপর্যায়ে বর্তমান মাসগুলোতে হযরত ফকীহুল মিল্লাত (দা.বা.) হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। দেশে-বিদেশে তাঁর চিকিৎসার এক প্রলম্ব ফিরিস্তি। তিনি চলতে-ফিরতে পারেন না। ক্ষণিক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি। খাওয়া-দাওয়াও বন্ধ প্রায়। হঠাৎ হঠাৎ অবস্থার পরিবর্তন। সারা দুনিয়ার বিভিন্ন জনপদে তাঁর জন্য কৃত দু'আই যেন তাঁর বর্তমান জীবনোপকরণ।

ইতিমধ্যেই বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন দারুল উলূম দেওবন্দের মোহতামিম হযরত মাওলানা মুফতী আবুল কাসেম নূমানী সাহেব দা.বা., অল ইন্ডিয়া জমিয়াতে উলামায়ে হিন্দের সদর ও দারুল উলূম দেওবন্দের সিনিয়র মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা সায়্যিদ আরশাদ মাদানী সাহেব দা. বা., দরুল উলূম দেওবন্দের শায়খে ছানী হযরত মাওলানা আব্দুল হক আজমী সাহেব, দারুল উলূম দেওবন্দের মুহাদ্দিস মুফতী জমীল আহমদ সাহেব, অল ইন্ডিয়া জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সেক্রেটারি হযরত মাওলানা মাহমূদ মাদানীসহ বরেণ্য ও প্রখ্যাত উলামায়ে কেরাম তাঁকে দেখে গেলেন, দু'আ করে গেলেন। প্রায় উলামায়ে কেরামের হলকায় তাঁর জন্য দু'আ জারি আছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে হায়াতে তায়্যিবা দান করুন। আমীন

আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমত, এহেন পেরেশানি ও শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে তাঁর বড় সাহেবজাদা হযরত মাওলানা মুফতী আরশাদ রহমানী সাহেবের এহতেমামীতে বর্তমান রমাজান মাসেও শত শত উলামায়ে কেরাম ও তালাবায়ে এজাম উত্তম রূপে রমাজান উদ্‌যাপনে মারাকাযে জমায়েত হয়েছেন। ই'তিকাফকারী উলামায়ে কেরাম, তাসহীহে কোরআন ও তাদরীবে অংশ নেওয়া তালাবায়ে এজাম অত্যন্ত খুলুসিয়াতের সাথে যথাসাধ্য যাবতীয় আমলে অংশ নিয়েছেন। উত্তম রূপে তারাবীহ, তাসবীহ তাহলীল, কোরআন তেলাওয়াত, পবিত্র কোরআনের দওর, যিকির, তাহাজ্জুদ, ইবাদতের মাধ্যমে রাত্রি জাগরণ, কায়মনোবাক্যে দু'আ, ওয়াজ নসীহত, সুলুক ও তাযকিয়া ইত্যাদি আমলের এক অন্য রকম পরিবেশে প্রত্যেকে যথাযোগ্য মার্যাদা ও গুরুত্ব দিয়ে সুন্নাত তরীকায় রমাজানের হক আদায় করার চেষ্টায় লিপ্ত আছেন। তদুপরি সকলে হযরতের জন্য আল্লাহর দরবারে আহাজারির মাধ্যমে দু'আ রত। মারকাযের আসাতিজা এবং ছাত্রগণ অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে মেহমানদের খেদমাত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

এদিকে হযরত ফকীহুল মিল্লাত (দা. বা.) হাসপাতালের আইসিইউতে সামান্য সম্বিত ফিরে পেলেই বলেন, আমাকে মারকাযে নিয়ে যাও। রমাজানের সব আমল ঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না? মেহমানদের মেহমানদারী ঠিকভাবে হচ্ছে কি না?

আল্লাহ! এই উম্মাহদরদি তোমার বান্দাকে শেফায়ে কামেলা আজেলা নসীব করুন। তাঁর নিরবচ্ছিন্ন অক্লান্ত মেহনতে অঙ্কুরিত ও বিকশিত সুন্নাতে নববী চর্চার এই ঝর্ণাধারা কিয়ামত পর্যন্ত যেন জারি থাকে এই কামনায়...।

নির্বাহী সম্পাদক

২৯/০৬/২০১৫

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ (٢٢) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا اٰتَاكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (٢٣) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (٢٤)

২২. পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর কোনো বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।

২৩. এটা এ জন্য বলা হলো যে, যাতে তোমরা যা হারাও তজ্জন্য দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তজ্জন্য উল্লসিত না হও। আল্লাহ কোনো উদ্ধত ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

২৪. যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার প্রতি উৎসাহ দেয়, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (সূরা হাদীদ)

দুটি পার্থিব বিষয় মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ও পরকালের চিন্তা থেকে গাফিল করে দেয়। এক. সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, যাতে লিপ্ত হয়ে মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়। এ থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। দুই. বিপদাপদ, এতে জড়িত হয়েও মানুষ মাঝে মাঝে নিরাশ ও আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে যায়।

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ.....

অর্থাৎ পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপদাপদ আসে, তা সবই আমি কিতাবে অর্থাৎ লাওহ মাহফুজে জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই লিখে দিয়েছিলাম। পৃথিবীর বিপদাপদ বলে দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ফসলহানি, বাণিজ্যে ঘাটতি, ধনসম্পদ বিনষ্ট হওয়া, বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত বিপদাপদ বলে সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি, ক্ষত, আঘাত ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে।

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا أَتَاكُمْ

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে মানুষ যা কিছু বিপদ অথবা সুখ, আনন্দ অথবা দুঃখের সম্মুখীন হয় তা সবই আল্লাহ তা'আলা লাওহে মাহফুযে মানুষে জন্মের পূর্বেই লিখে রেখেছেন। এ বিষয়ে সংবাদ তোমাদেরকে এ জন্য দেওয়া হয়েছে, যাতে তোমরা দুনিয়ার ভালো-মন্দ অবস্থা নিয়ে বেশি চিন্তা-ভাবনা না করো। দুনিয়ার কষ্ট ও বিপদাপদ তেমন আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় নয় এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং অর্থসম্পদ তেমন উল্লসিত ও মত্ত হওয়ার বিষয় নয় যে, এগুলোতে মশগুল হয়ে তোমরা আল্লাহর স্মরণ ও পরকাল সম্পর্কে গাফিল হয়ে যাবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, প্রত্যেক মানুষ স্বভাবগতভাবে কোনো কোনো বিষয়ের কারণে আনন্দিত এবং কোনো কোনো বিষয়ের কারণে দুঃখিত হয়। কিন্তু যা উচিত তা এই যে, বিপদের সম্মুখীন হলে সবর করে পরকালের পুরস্কার ও সাওয়াব অর্জন করতে হবে এবং সুখ ও আনন্দের সম্মুখীন হলে কৃতজ্ঞ হয়ে পুরস্কার ও সাওয়াব হাসিল করতে হবে। (রূহুল মাআনী)

এরপর ইরশাদ হচ্ছে–

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

আল্লাহ তা'আলা উদ্ধত ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না। উদ্দেশ্য হলো, দুনিয়ার নিয়ামত পেয়ে যারা অহংকার করে, তারা আল্লাহর কাছে ঘৃণার্হ। কিন্তু পছন্দ করেন না, বলে ইঙ্গিত আছে যে, বুদ্ধিমান ও পরিণামদর্শী মানুষের কর্তব্য হলো প্রত্যেক কাজে আল্লাহর পছন্দ ও অপছন্দের চিন্তা করা। তাই এখানে অপছন্দ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

(এখানে অভ্যন্তরীণ গুণাবলির কারণে অহংকার অর্থে اختيال শব্দ এবং বাহ্যিক ধনসম্পদ ইত্যাদির কারণে অহংকার অর্থে প্রায়ই فخر শব্দ ব্যবহৃত হয়)

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

এই আয়াতে কৃপণতার নিন্দা করা হচ্ছে। অর্থাৎ যারা (দুনিয়ার মোহে) নিজেরাও (আল্লাহর পছন্দনীয় খাতে ব্যয় করতে) কৃপণতা করে (যদিও খেয়াল খুশি ও পাপকাজে ব্যয় করতে মুক্তহস্ত থাকে) এবং (এই পাপও করে যে) অপরকে কৃপণতার আদেশ দেয়। (الذين ব্যাকরণিক কায়দায় بدل কিন্তু এর উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, শাস্তি আদেশ সব কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বরং প্রতিটি মন্দ স্বভাবের জন্য শাস্তির আদেশ উচ্চারিত হয়েছে এবং ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়ার মোহ এমন যে এর সাথে অধিকাংশ মন্দ স্বভাবের সমাবেশ ঘটেই যায়। অহংকার, গর্ব, কৃপণতা ইত্যাদি) যে ব্যক্তি (সত্য ধর্ম থেকে যার এক শাখা আল্লাহর পথে ব্যয় করা) মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আল্লাহ তা'আলার কোনো ক্ষতি করে না। কারণ তিনি (সকলের ইবাদত ও ধনসম্পদ থেকে) অভাবমুক্ত (এবং স্বীয় সত্তা ও গুণাবলিতে) প্রশংসার্হ।

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

কোরআন মজীদের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৭

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক আল-আবরার। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখানে ফাজায়েলে যিকিরে উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

হাদীস নং ১৮ :

عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف، أن هذه الآية لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بعض أبياته (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) فخرج يلتمس، فوجد قوما يذكرون الله، منهم ثائر الرأس، وجاف الجلد، وذو الثوب الواحد، فلما رآهم جلس معهم، فقال" :الحَمْدُ للهِ الَّذِى جَعَلَ لى فِى أُمَّتِى مَنْ أمرنى أنْ أصبِرَ نَفْسى مَعَهُ"

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ঘরে অবস্থান করছিলেন, এমন সময় আয়াত واصبر نفسك نাযিল হল। যার অর্থ, হে নবী! আপনি নিজেকে ঐ সকল লোকের নিকট বসার পাবন্দ করুন, যারা সকাল-সন্ধা আপন পরোয়ারদেগারকে ডাকে। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সমস্ত লোকদের তালাশে বের হলেন এবং একদল লোক দেখলেন, যারা আল্লাহর যিকিরে মশগুল। তাদের মধ্যে কিছুলোক এমন আছে, যাদের চুল এলোমেলো, শরীরের চামড়া শুকনা, একটি মাত্র কাপড় পরণে (অর্থাৎ শুধু লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায়)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দেখে তাদের সাথে বসে পড়লেন এবং বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক পয়দা করেছেন যে, স্বয়ং আমাকে তাদের সাথে বসার হুকুম করিয়াছেন। (জামিউল বায়ান [ইবনে জারীর] ৮/১৫হা. ১৫৫, তাফ: দুররে মনসূর ৫/৩৮০)

হাদীসটির মান :

হাসান লিশাওয়াহিদিহী।

ক. এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তালাশ করে মসজিদের শেষ অংশে উপবিষ্ট আল্লাহর যিকিরে মশগুল পেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আমার জীবদ্দশায়ই এমন লোক পয়দা করেছেন, যাদের নিকট বসার জন্য আমাকে হুকুম করা হয়েছে। অতঃপর ইরশাদ করলেন, তোমাদের সাথেই আমার জীবন, তোমাদের সাথেই মরণ অর্থাৎ তোমরাই আমার জীবন-মরণের সাথী ও বন্ধু।

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، ..... فَقَامَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَمِسُهُمْ حَتّٰى أَصَابَهُمْ فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ، فَقَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى لَمْ يُمِتْنِى حَتّٰى أَمَرَنِى أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِى مَعَ رِجَالٍ مِنْ أُمَّتِى، مَعَكُمُ الْمَحْيَا وَمَعَكُمُ الْمَمَاتُ

(জামেউল বায়ান [ইবনে জারীর তাবারী] ৮/১৫ হা. ২৩০২২, তাফসীরে যাদুল মাসীর ৩/৭৯, শুআবুল ঈমান [বায়হাকী] হা. ১০৪৯৪, দালায়েল [বায়হাকী] ১/৩৫১,৩৫২)

হাদীসটির মান : হাসান লি শওয়াহিদিহী।

খ. এক হাদীসে আছে, হযরত সালমান ফারসী (রা.) এবং আরও অন্যান্য সাহাবীদের এক জামাত আল্লাহর যিকিরে মশগুল ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে তশরীফ আনলে সকলেই চুপ হয়ে গেলেন। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি করছিলে? তাঁরা আরজ করলেন, আমরা আল্লাহর যিকিরে মশগুল ছিলাম। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি দেখতে পেলাম তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত নাজেল হচ্ছে। তখন আমারও আকাঙ্ক্ষা হলো তোমাদের সাথে শরীক হই।

অতঃপর এরশাদ করলেন, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক পয়দা করেছেন, যাদের নিকট বসার জন্য আমাকে হুকুম করা হয়েছে।

كَانَ سلمَان فِي عِصَابَة يذكرُونَ الله فَمر النَّبِي فكفوا فَقَالَ : مَا كُنتُم تَقولُونَ قُلنَا :نذْكر الله قَالَ :فَإِنِّي رَأَيت الرَّحْمَة تنزل عَلَيْكُم فَأَحْبَبْت أَن أشارككم فِيهَا ثمَّ قَالَ الْحَمد لله الَّذِي جعل فِي أمتِي من أمرت أَن أَصْبِر نَفسِي مَعَهم

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ :كَانَ سَلْمَانُ فِي عِصَابَةٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ فَمَرَّ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُمْ قَاصِدًا حَتَّى دَنَا مِنْهُمْ فَكَفُّوا عَنِ الْحَدِيثِ إِعْظَامًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ :مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ الرَّحْمَةَ تَنْزِلُ عَلَيْكُمْ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُشَارِكَكُمْ فِيهَا

(কিতাবুয যুহদ [ইমাম আহমদ রহ.], দুররে মনসূর ৫/৩৮২, মুসতাদরাকে হাকেম ১/২১০)

হাদীসটির মান : সহীহ (মুসতাদরাকে হাকেম ১/২১০)

গ. হাদীসে আছে, গাফেলদের মধ্যে থেকেও যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করল, সে যেন জিহাদের ময়দানে পলায়নকারী দলের মধ্যে হইতে অটল থাকিয়া একাকী মোকাবেলা করল।

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ، بِمَنْزِلَةِ الصَّابِرِ فِي الْفَارِّينَ

(তাবারানী [কাবীর] ১০/১৯ হা. ৯৭৯৭, তাবারানী [আওসাত ১/১৪১ হা. ২৭৩, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৮০ হা. ১৬৭৯৩, হিলয়াতুল আওয়লিয়া ৪/২৬৮ হা. ২৭৪, মুসনাদে দায়লামী ২/২৪২ হা. ৩১৩৯)

হাদীসটির মান : হাসান

ঘ. এক হাদীসে আসেছে যে, গাফেলদের মধ্যে আল্লাহর যিকিরকারী ঐ ব্যক্তির মত যে পলায়নকারীদের পক্ষ হতে কাফেরদের মোকাবিলা করে। অনরূপভাবে সে যেন অন্ধকার ঘরে বাতিস্বরূপ এবং পাতাবিহীন বৃক্ষসমূহের মধ্যে সবুজ পাতাভরা একটি বৃক্ষস্বরূপ। এইরূপ ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর পূর্বেই জান্নাতে তার ঘর দেখিয়ে দেবেন। আর সমস্ত মানুষ ও প্রাণীর সমপরিমাণ মাগফেরাত করে দেবেন।

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ كَالَّذِي يُقَاتِلُ عَنِ الْفَارِّينَ، وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ مِثْلُ الْمِصْبَاحِ فِي الْبَيْتِ الْمُظْلِمِ، وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ كَالشَّجَرَةِ الْخَضْرَاءِ فِي وَسَطِ الشَّجَرِ الْيَابِسِ، وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ يُعَرِّفُهُ اللَّهُ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ فَصِيحٍ وَأَعْجَمِيٍّ، فَالْفَصِيحُ بَنُو آدَمَ، وَالأَعْجَمِيُّ الْبَهَائِمُ

(শুআবুল ঈমান [বায়হাকী] ১/৪১১ হা. ৫৬৫, হিলয়াতুল আওলিয়া ৬/১৮১, মুসনাদে দায়লামী ২/২৪২ হা. ৩১৪০, কামেল [ইবনে আদী[৫/৯১ হা. ১২৬৯)

হাদীসটির মান : সহীহ

হাদীস নং ১৯:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَذْكُرُ عَنْ رَبِهِ عَزَّ وَجَلَّ :ابْنَ آدَمَ اذْكُرْنِي بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ سَاعَةً أَكْفِكَ مَا بَيْنَهُمَا

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার পবিত্র ইরশাদ নকল করছেন যে, তুমি ফজর ও আছর নামাযের পর সামান্য সময় আমার যিকির কর। আমি মধ্যবর্তী সময়ের জন্য তোমার যাবতীয় প্রয়োজন মিটিয়ো দেব।

(যুহুদ [আহমদ] ১/৩৪ হা. ২০৩, হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/২১৩, তাফসীরে দুররে মনসূর ৬/৬২০, জামেউল আহাদীস ১৪৯৫৪, জামেউস সগীর হা. ৮৪৭১, কানযুল উম্মাল ১৭৯৫)

হাদীসটির মান : হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

ক. আরেক হাদীসে আছে, আল্লাহর যিকির করতে থাক; এটি তোমার উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য সহায়ক হবে।

اذكر الله فإنه عون لك على ما تطلب

(জামেউস সগীর ১/১৯৮ হা. ১৯০২, কানযুল উম্মাল ১/৪১৫ হা. ১৭৫৫)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

খ. এক হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, যারা ফজরের নামাযের পর হতে সূর্য উঠা পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে তাদের সাথে বসা আমার নিকট চারজন আরবী গোলাম আজাদ করা হতে অধিক পছন্দনীয়। এমনিভাবে আছরের নামাযের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যিকিরকারীদের সঙ্গে বসা আমার নিকট চারজন আরবী গোলাম আজাদ করা হতে অধিক পছন্দনীয়।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ تَعَالَى مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً

(আবু দাউদ ২/৫১৬ হা. ৩৬৬৭, শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ১/৪০৯ হা. ৫৬০, জামেউস সগীর ৩/১৪৫৬ হা. ৭২০৩)

হাদীসটির মান : হাসান

গ. এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতের সাথে আদায় করে সূর্য উঠা পর্যন্ত যিকিরে মশগুল থাকে, অতঃপর দুই রাকাত নফল নামায পড়ে, সে একটি কামেল হজ্ব ও একটি কামেল ওমরার ছওয়াব পাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন, ফজরের নামাযের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত কোন জামাতের সহিত যিকিরে মশগুল থাকা আমার নিকট দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু হতে অধিক প্রিয়। এমনিভাবে আছরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন জামাতের সাথে যিকিরে মশগুল থাকা আমার নিকট দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু হতে অধিক প্রিয়।

عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالُوا :أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ فَقَالَ :إِنَّمَا بُعِثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّيْفِ وَلَكِنْ قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ :لَأَنْ "أَذْكُرَ اللهَ مَعَ قَوْمٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَأَنْ أَذْكُرَ اللهَ مَعَ قَوْمٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ جَلَسَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، انْقَلَبَ بِأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ

(তাবারানী কাবীর ৮/২০৯ হা. ৭৭৪১, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/১০৪ হা. ১৬৫৩৮, তিরমিযী ১/৫৮৬)

হাদীসটির মান : হাসান

ঘ. এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর ঐ অবস্থায় বসা থেকে কোন কথা বলার আগে এই দু'আ দশবার পড়বে তার জন্য দশটি নেকী লেখা হবে, দশটি গোনাহ মাফ হবে, জান্নাতে দশগুণ মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে এবং সমস্ত দিন শয়তান ও যাবতীয় ক্ষতিকর বস্তু হতে হেফাজত থাকবে। দু'আটি এই–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত রাজত্ব তাঁরই। সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মরণ দান করেন। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ ثَانٍ رِجْلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ :لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ، كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ يَوْمَهُ ذٰلِكَ كُلَّهُ فِي حِرْزٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ، وَحُرِسَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَمْ يَنْبَغِ لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا الشِّرْكَ بِاللّٰهِ ـ

(তিরমিযী ২/১৮৫ হা. ৩৪৭৪, মুসনাদে আহমদ ৪/২২৭ হা. ১৭৯৯০, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/২৩৫ হা. ৩১৯২, তাবারানী [আওসাত] ৫/১১৭ হা. ৪৬৪৩, আ'মালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা ৫৮ হা. ১২৭)

হাদীসটির মান : সহীহ লিগাইরিহী

ঙ. এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ফজর ও আছরের পর এই এস্তেগফার তিনবার পড়বে, তার গোনাহ সমুদ্র পরিমাণ হলেও মাফ হয়ে যাবে। এস্তেগফারটি এই–

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নিকট সমস্ত গোনাহের মাগফেরাত চাইছি, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। আর তাঁরই দিকে ফিরে যাচ্ছি; তওবা করছি।

عَنْ مُعَاذٍ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " :مَنْ قَالَ بَعْدَ الْفَجْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ :أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، كُفِّرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ "

(আ'মালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা ১১২ হা. ১২৬, তাবারানী [সগীর] ২/২৬ হা. ৮৩৯, মাজমাউয যাওয়াঈদ ১০/১০৪ হা. ১৬৯৩৪)

হাদীসটির মান : হাসান লি শাওয়াহিদিহী

হাদীস নং ২০ :

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহর যিকির ও এর নিকটবর্তী বস্তুসমূহ এবং আলেম ও দ্বীনের তালেবে-এলেম ছাড়া দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু অভিশমপ্ত (অর্থাৎ আল্লাহর রহমত হতে দূরে)।

(তিরমিযী ২/৫৮ হা. ২৩২২, ইবনে মাজাহ ২/৩০২ হা. ৪১১২, শুআবুর ঈমান [বায়হাকী] ২/২৬৫ হা. ১৭০৯, আততারগীব ১/৫৪, জামেউস সাগীর ২/৮৮৭ হা. ৪২৮১, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১২২ হা. ৪৯২, তাবারানী [আওসাত] ৪/৪১৪)

হাদীসটির মান : হাসান (তিরমিযী)

এক হাদীসে আছে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করা আল্লাহকে ভয় করার শামিল। ইলমের তলবও তালাশে কোথাও যাওয়া এবাদত। আর তা মুখস্থ করা এইরূপ যেমন তছবীহ পড়া। ইলম নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা জিহাদের শামিল। তা পাঠ করা দান-খয়রাত সমতুল্য। যোগ্য পাত্রে তা দান করা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। কেননা, ইলম জায়েয নাজায়েয চেনার উপায় এবং জান্নাতে পৌঁছার জন্য পথের নিশানা। নিঃসঙ্গ অবস্থায় সান্তনাদানকারী এবং সফরের সাথী। কেননা, কিতাব দেখার দ্বারা উভয় কাজ হাছিল হয়, এমনিভাবে একাকী অবস্থায় আলাপ -আলোচনাকারী, সুখে-দুঃখে দলীল স্বরূপ। দুশমনের বিরুদ্ধে, দোস্ত-আহবাবের জন্য হাতিয়ার স্বরূপ। এর কারণে আল্লাহ তা'আলা ওলামায়ে কেরামকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। কেননা তারা কল্যাণের দিকে আহবানকারী হন এবং তারা এইরূপ ইমাম ও নেতা হন যে, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা হয়, তাদের কার্যকলাপের অনুকরণ করা হয়, তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়। ফেরেশতারা তাদের সাথে দোস্তি করার আগ্রহ রাখে, বরকত হাছিল করার জন্য অথবা মহব্বতের পরিচয় স্বরূপ আপন ডানা তাদের উপর মোছন করে। দুনিয়ার আদ্র শুষ্ক প্রত্যেক বস্তু তাদের মাগফেরাতের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করে। এমনকি সমুদ্রের মাছ, জঙ্গলের হিংস্র প্রাণী, চতুষ্পদ জন্তু, বিষাক্ত জানোয়ার, সাপ ইত্যাদী পর্যন্ত তাদের গোনাহমাফীর জন্য দু'আ করে। আর এসব ফযীলত এইজন্য যে, এলেম হলো অন্তরের নূর, চোখের আলো। ইলমের কারণেই বান্দা উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতে পরিণত হয়। দুনিয়া ও আখেরাতের উচ্চ মর্যাদা হাসিল করে। ইলম অধ্যয়ন করা রোযা সমতুল্য। তা ইয়াদ করা তাহাজ্জুদের সমতুল্য। এর দ্বারাই আত্মীয়তার সম্পর্ক জুড়ে থাকে। ইলম দ্বারাই হালাল-হারাম জানা যায়। এলেম হলো আমলের ইমাম আর আমল হল এর অনুগামী। নেক লোকদেরকেই ইলমের এলহাম করা হয়। হতভাগারা তা হতে মাহরূম থাকে।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ؛ فَإِنَّ تَعْلِيمَهُ لِلَّهِ خَشْيَةٌ وَطَلَبَهُ عِبَادَةٌ، وَمُذَاكَرَتَهُ تَسْبِيحٌ وَالْبَحْثَ عَنْهُ جِهَادٌ، وَتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، وَبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ؛ لِأَنَّهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَمَنَارُ سُبُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَهُوَ الْأُنْسُ فِي الْوَحْشَةِ وَالصَّاحِبُ فِي الْغُرْبَةِ وَالْمُحَدِّثُ فِي الْخَلْوَةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وَالسِّلَاحُ عَلَى الْأَعْدَاءِ، وَالزَّيْنُ عِنْدَ الْأَخِلَّاءِ، يَرْفَعُ اللَّهُ بِهِ أَقْوَامًا فَيَجْعَلُهُمْ فِي الْخَيْرِ قَادَةً وَأَئِمَّةً يُقْتَصُّ آثَارُهُمْ، وَيُقْتَدَى بِأَفْعَالِهِمْ وَيُنْتَهَى إِلَى رَأْيِهِمْ، تَرْغَبُ الْمَلَائِكَةُ فِي خُلَّتِهِمْ وَبِأَجْنِحَتِهَا تَمْسَحُهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَحِيتَانُ الْبَحْرِ وَهَوَامُّهُ وَسِبَاعُ الْبَرِّ وَأَنْعَامُهُ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ مِنَ الْجَهْلِ وَمَصَابِيحُ الْأَبْصَارِ مِنَ الظُّلَمِ يَبْلُغُ الْعَبْدُ بِالْعِلْمِ مَنَازِلَ الْأَخْيَارِ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالتَّفَكُّرُ فِيهِ يَعْدِلُ الصِّيَامَ وَمُدَارَسَتُهُ تَعْدِلُ الْقِيَامَ بِهِ تُوصَلُ الْأَرْحَامُ وَبِهِ يُعْرَفُ الْحَلَالُ مِنَ الْحَرَامِ وَهُوَ إِمَامٌ وَالْعَمَلُ تَابِعُهُ يُلْهَمُهُ السُّعَدَاءُ وَيُحْرَمُهُ الْأَشْقِيَاءُ، هَكَذَا حَدَّثَنِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ مَرْفُوعًا بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ جِدًّا وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ قَوِيٌّ

(জামেউ বয়ানুল ইলম ওয়া ফাজলিহী পৃ ৫৪, হিলয়াতুল আওলিয়া ১/২৩৮, তাফসীরুর রাযী ২/৪০৯)

হাদীসটির মান : হাসান

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

দরসে ফিক্বহ

যাকাত : আহকাম ও মাসায়েল

মুফতী শাহেদ রহমানী

যাকাতের সংজ্ঞা

শরীয়তের পরিভাষায় যাকাত বলা হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বিশেষ সম্পদ হতে নির্দিষ্ট একটি অংশ শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বিশেষ শ্রেণীর মানুষকে মালিক বানিয়ে দেওয়া।

এভাবেও বলা যেতে পারে, যাকাত এমন হক তথা অধিকারের নাম, যা বিশেষ বিশেষ ধন-সম্পদে ফরজ হয় এবং বিশেষ শ্রেণীর লোক ও খাতে ব্যয় হয়।

হুকুম

যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম। যাকাত ফরজ হওয়ার যাবতীয় শর্ত পাওয়া গেলে একজন মুসলমানের ওপর ফরজে আইন এবং এর অস্বীকারকারী ইসলামের গণ্ডিবহির্ভূত।

যাকাত প্রদানের ফজিলত

যাকাত প্রদানের ফজিলতসংক্রান্ত অসংখ্য হাদীস হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো।

১। ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

حصنوا اموالكم بالزكوٰة وداووا مرضاكم بالصدقة واعدوا للبلاء الدعاء

তোমরা তোমাদের সম্পদকে বিপদমুক্ত রাখো যাকাত প্রদানের মাধ্যমে। আর দান-সদকার মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা করো। যে কোনো বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্য দু'আর প্রতি গুরুত্বারোপ করো। (তাবরানী)

২। হযরত জাবের (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

اذا اديت زكوة مالك فقد اذهبت عنك شره

যখন তুমি মালের যাকাত আদায় করলে তখন তুমি তার অনিষ্টকে তোমার থেকে দূরে সরিয়ে দিলে। (ইবনে খুযাইমা)

৩। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

ان من تمام اسلامكم ان تؤدوا زكوة اموالكم

তোমরা পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়ার নিদর্শন হলো মালের যাকাত প্রদান করা। (তাবারানী)

৪। আরেক হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

برئ من الشح من ادى الزكوة

যাকাত প্রদানকারী কৃপণতামুক্ত। (তাবরানী)

৫। হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

لايقبل الله صلاة رجل لا يؤدى الزكوة حتى يجمعهما فان الله تعالى قد جمعهما فلا تفرقوا بينهما

যে ব্যক্তি যাকাত প্রদান করে না আল্লাহ তা'আলা তার নামায কবুল করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে উভয়টি আদায় না করবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা উভয়টিকে একই সাথে উল্লেখ করেছেন। অতএব তোমরা কার্যক্ষেত্রে এই দুটির মাঝে বিভাজন তৈরি করো না। (কানযুল উম্মাল ১৫৭৮৪)

অনাদায়ে শাস্তি

ফরজ হওয়া সত্ত্বেও যাকাত অনাদায়ীর জন্য রয়েছে শাস্তির ব্যবস্থা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "যারা সোনা-রুপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। যেদিন সে ধন-সম্পদ জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে। তারপর তা দ্বারা তাদের কপালে তাদের পাঁজর ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে (এবং বলা হবে) এই হচ্ছে সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে তার মজা ভোগ করো। (সূরা তাওবা, আয়াত নং ৩৪, ৩৫)

যাকাত প্রদান না করলে ভয়াবহ শাস্তির কথা অসংখ্য হাদীসেও উল্লেখ রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো।

১। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

من اتاه الله مالا فلم يؤد زكوته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعنى شدقيه ثم يقول انا مالك انا كنزك

আল্লাহ তা'আলা যাকে সম্পদ দান করেছেন কিন্তু সে তার যাকাত প্রদান করল না তাহলে কিয়ামতের দিন ওই সম্পদকে বিষাক্ত সাপের রূপ দেওয়া হবে। যার চোখের ওপর থাকবে দুটি কালো চিহ্ন। কিয়ামতের দিন এই সাপ তাকে পেঁচিয়ে ধরবে অতঃপর সে তাকে দংশন করবে আর বলতে থাকবে, আমি তোমার সাধের মাল ও রক্ষিত সম্পদ। (বুখারী)

২। ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

لم يمنع قوم زكوٰة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولو لا البهائم لم يمطروا

যে জাতি যাকাত প্রদান করবে না তারা অনাবৃষ্টিতে পতিত হবে, যদি চতুষ্পদ জন্তু না থাকত তাহলে তারা অনাবৃষ্টিতেই থাকত। (তাবারানী)

৩। হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

ما تلف مال فى بر ولا بحر الا بحبس الزكوٰة

জলে ও স্থলে সম্পদ ধ্বংস হওয়ার একমাত্র কারণ যাকাত প্রদান না করা। (মুসনাদে তায়ালেসী)

৪। হযরত বুরায়দা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

ما منع قوم الزكوٰة الا ابتلاهم الله بالسنين

যে জাতি যাকাত প্রদান করবে না আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুর্ভিক্ষে পতিত করবেন। (মুসনাদে তায়ালেসী)

৫। আদী বিন হাতেম (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

يوشك ان يأتى على الناس زمان يشق على الرجل ان يخرج فيه زكوة ماله

একটি সময় আসবে, যখন মানুষ সম্পদের যাকাত প্রদান করাকে কষ্টসাধ্য ব্যাপার মনে করবে। (তাবারানী)

যাকাত ফরজ হওয়ার ভিত্তি

যাকাত ফরয হওয়ার মূল ভিত্তি হলো, বর্ধনশীল নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া।

যাকাতের শর্ত

শর্ত দুই ভাগে বিভক্ত :

১. ওয়াজিব হওয়ার শর্ত

২. সহীহ-শুদ্ধ হওয়ার শর্ত

ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ

এক. স্বাধীন হওয়া। সুতরাং পরাধীন গোলাম বান্দীর ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

দুই. মুসলমান হওয়া। সুতরাং অমুসলিম ও মুরতাদের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

তিন. বালেগ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। উল্লেখ্য, সদকায়ে ফিতর অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ের ওপরও ওয়াজিব।

চার. বুদ্ধি ও বোধশক্তিসম্পন্ন হওয়া। অতএব পাগলের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

পাঁচ. ধন-সম্পদ যাকাতের উপযোগী হতে হবে। এ ধরনের সম্পদের একটি মৌলিক সূচি নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. স্বর্ণ।

২. রুপা।

৩. দেশি-বিদেশি কারেন্সি।

৪. ব্যবসায়িক পণ্য। (এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরে উল্লেখ করা হবে।)

৫. ক্ষেতে উৎপাদিত ফসল ও ফলফলাদি।

৬. গৃহপালিত পশু, যেগুলো মুক্তভাবে বিচরণ করে খাদ্য গ্রহণ করে।

৭. খনিজ সম্পদ

ছয়. সম্পদ নিসাবের পরিমাণ হওয়া বা নিসাবের সমমূল্যের হওয়া।

যাকাতের রুকন

যাকাতের রুকন হলো, নিসাবের নির্দিষ্ট একটি অংশকে নিজের মালিকানামুক্ত করে যাকাত নেওয়ার উপযোগী কোনো ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়া, বা তার প্রতিনিধির হাতে অর্পণ করা। (বাদায়ে ২/৩৯)

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময়

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার যাবতীয় শর্ত পুরোপুরি পাওয়া যাওয়ার সাথে সাথে যাকাত ওয়াজিব হয়ে যায়। শরয়ী কারণ ছাড়া আদায়ে বিলম্ব করা গুনাহের কাজ। (শামী ২/২৭১-২৭২, ফতহুল কদীর ২/১৬৫-১৬৬)

কতবার আদায় করতে হবে

ক. স্বর্ণ, রুপা, মুদ্রা, গবাদিপশু ও ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত বছরে একবার।

খ. শস্য ও ফলফলাদি যতবার উৎপন্ন হবে, ততবার। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ২/৬৬৪)

অগ্রিম যাকাত প্রদান

ক. নিসাবের মালিক হওয়া ছাড়া অগ্রিম যাকাত প্রদান করলে তা যাকাত হিসেবে বিবেচিত হবে না।

খ. নিসাবের মালিক হয়ে বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই যাকাত প্রদান করলে তা আদায় হয়ে যাবে। (বাদায়ে ২/৫০)

সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেলে

ক. যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর বিনা কারণে যে পরিমাণ সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে ততটুকুর যাকাত মাফ হয়ে যাবে। পুরো ধ্বংস হলে পুরোটাই রহিত হয়ে যাবে।

খ. ইচ্ছাকৃত ধ্বংস বা নষ্ট করলে হুকুমের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হবে না। বরং পুরো হিসাব মোতাবেক যাকাত দিতে হবে। (ফতহুল কদীর ২/১৭৯)

নিসাবের বিবরণ

ক. স্বর্ণ ৭.৫ তোলা = ৯৫.৭৪৮ গ্রাম প্রায়।

খ. রুপা ৫২.৫ তোলা = ৬৭০.২৪ গ্রাম প্রায়। (আহসানুল ফতোয়া ৪/৩৯৪, আল ফিক্বহুল ইসলামী ২/৬৬৯)

উল্লেখ্য, দেশি-বিদেশি মুদ্রা ও ব্যবসায়িক পণ্যের নিসাব নির্ধারণে স্বর্ণ-রুপা হলো পরিমাপক। এ ক্ষেত্রে ফকীর-মিসকীনদের জন্য যেটি বেশি লাভজনক হবে, সেটিকে পরিমাপক হিসেবে গ্রহণ করাই শরীয়তের নির্দেশ। সুতরাং মুদ্রা ও পণ্যের বেলায় বর্তমানে রুপার নিসাবই পরিমাপক হিসেবে গণ্য হবে।

অতএব, যার নিকট ৫২.৫ তোলা সমমূল্যের দেশি-বিদেশি মুদ্রা বা ব্যবসায়িক পণ্য মজুদ থাকবে, তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

সাত. সম্পদের পরিপূর্ণ মালিকানা, অর্থাৎ সম্পদে অন্যের কোনো হক/ অধিকার না থাকা এবং তাতে মালিকের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হওয়া। (আল মা'আইর নং ৩৫, পৃ. ৪৭৪)

আট. চন্দ্র মাসে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া।

উল্লেখ্য, চন্দ্র মাস হিসাবে যাকাত আদায় করলে যাকাতের পরিমাণ হবে ২.৫%, সৌরবর্ষ হিসাবে দিলে যাকাত দিতে হবে ২.৫৮%।

শস্য, ফলমূল ও খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। বরং উৎপাদন ও উত্তোলন শর্ত। (আল মা'আঈর নং ৩৫, পৃ. ৪৭৪)

বি. দ্র. নিসাব পরিমাণ মাল বছরের শুরু এবং শেষে বিদ্যমান থাকা শর্ত। মধ্যবর্তী সময়ে সম্পদের পরিমাণ নিসাব থেকে কমে গেলেও বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই আবার নিসাব পূর্ণ হলে যাকাত দিতে হবে।

(বাদায়েউস সানায়ে' ২/৫১, আল ফিক্বহুল ইসলামী ২/৬৫৫)

নয়. ঋণমুক্ত হওয়া

উল্লেখ্য, ব্যবসায়িক ঋণের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, ঋণ গ্রহণ করে তা কোন খাতে ব্যয় করা হয়েছে। যদি ব্যয়ের খাত এমন কোনো পণ্য হয়, যা যাকাতের আওতায় পড়ে তাহলে এই ঋণ মূল নিসাব থেকে বিয়োগ হবে। আর যদি ব্যয়ের খাত যাকাতের আওতায় না পড়ে (যেমন–কোম্পানির ইমারত, মেশিন, পরিবহন ইত্যাদি) তাহলে এই ঋণ মূল নিসাব থেকে বিয়োগ হবে না। (ইসলাম আওর জাদীদ মাঈশত ওয়া তিজারত, পৃ. ৯৪)

দশ. হাজতে আসলিয়্যাহ থেকে অতিরিক্ত হওয়া। হাজতে আসলিয়্যাহ বলতে এমন প্রয়োজনকে বোঝানো হয়, যা মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। যেমন–আহারীয় খরচপাতি, বাসস্থান, পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদি। (আদ্দুররুল মুখতার ২/২৬২)

এগারো. সম্পদ বর্ধিষ্ণু হওয়া। অর্থাৎ ব্যবসার মাধ্যমে বাড়ানো সম্ভব হওয়া। আর গবাদিপশু স্ববর্ধিত বস্তুরই অন্তর্ভুক্ত। (আদ্দুররুল মুখতার ২/২৬৩, আল ফিক্বহুল ইসলামী ২/৬৫১)

যাকাত সহীহ-শুদ্ধ হওয়ার শর্ত

এক.

নিয়্যত করা

নিয়্যত করার সময়

ক. উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদানকালে।

খ. নিয়্যতবিহীন প্রদান করলে উপযুক্তের হাতে মাল থাকাবস্থায়।

গ. নিজের ওকীলের হাতে সোপর্দ করার সময়।

ঘ. মূল নিসাব হতে যাকাতের পরিমাণ পৃথক করার সময়। (আদ্দুররুল মুখতার ২/২৬৮)

দুই.

উপযুক্ত ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়া। (বাদায়েউস সানায়ে ২/৩৯)

ব্যবসায়িক পণ্যের সংজ্ঞা

ব্যবসায়িক পণ্য বলতে স্থাবর-অস্থাবর ওই সব পণ্যকে বোঝানো হয়, যার দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করা উদ্দেশ্য। পণ্যটি অবিকল বিক্রি করা হোক অথবা শিল্পায়নের পর। পণ্যের মালিকানা বিনিময়ের মাধ্যমে লাভ হোক অথবা বিনিময় ছাড়া। (আল মাআঈর নং ৩৫)

ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত

ক. ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য রুপার নিসাবের সমমানের হতে হবে।

খ. পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া।

গ. পণ্য ক্রয় বা মালিকানা অর্জনের সময় ব্যবসার নিয়্যত করা। ক্রয়ের সময় নিয়্যত না করলে ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সময় নিয়্যত করা।

ঘ. পণ্য ব্যবসার নিয়্যতের উপযোগী হওয়া। (বাদায়েউস সানায়ে ২/২১, আল ফিক্বহুল ইসলামী ২/৭১০)

পণ্যের মূল্য নির্ধারণ

পণ্য যে স্থানে মজুদ থাকবে সে স্থানের মার্কেট রেটে পণ্যের মূল্য নির্ণয় করা হবে। এ ক্ষেত্রে পাইকারি সেলাররা পাইকারি রেট, খুচরা বিক্রেতারা খুচরা দর, আর যেসব ব্যবসায়ী পাইকারি ও খুচরা উভয়ভাবে পণ্য সেল করে থাকে তারা যে দিকটির প্রধান্য থাকবে সেটির ভিত্তিতে পণ্যের মূল নির্ধারণ করবে। (আল মাআঈর, পৃ. ৪৭৭)

ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত টাকা/পণ্য

ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত টাকা দ্বারা প্রদান করাটাই মূল বিধান। তবে যাকাতের মুস্তাহিকদের স্বার্থ রক্ষা হলে সরাসরি পণ্য দ্বারাও যাকাত আদায় করা যাবে। (আল মাআঈর, পৃ. ৪৭৭)

পণ্যে একাধিক কারণ পাওয়া গেলে

কোনো পণ্যে ব্যবসার নিয়্যতের পাশাপাশি যাকাত ওয়াজিব হওয়ার অন্য কোনো কারণ পাওয়া গেলে, যেমন পণ্যটি গবাদিপশু বা কৃষিপণ্য। তাহলে এ ক্ষেত্রে এসব পণ্যের যাকাত ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবেই দিতে হবে। পশু বা কৃষিপণ্য হিসেবে নয়। (আল মাআঈর নং ৩৫)

যাকাতের আওতাভুক্ত পণ্যসামগ্রী

১. সব ধরনের কাঁচামাল (বাজারদরে)

২. যেসব পণ্য কারিগরি পরিবর্তনসহ বা ছাড়া বিক্রির জন্য রাখা হয়। (বাজারদরে)

৩. উৎপাদিত পণ্য।

৪. প্রক্রিয়াধীন পণ্য, এ ক্ষেত্রে যেদিন যাকাত ওয়াজিব হবে ওই দিনের বাজারদর ধর্তব্য হবে। কোনো কারণে বাজারদর জানা সম্ভব না হলে খরচাসহ ক্রয়মূল্য ধর্তব্য হবে।

৫. গুদামে মজুদ পণ্য, বাজারদর বিবেচিত হবে।

৬. রাস্তায় আনার পথে যেসব পণ্য রয়েছে। এ ক্ষেত্রে পণ্য যে স্থানে বা যে স্থানের কাছাকাছি থাকবে, সেখানের

বাজারদর ধর্তব্য হবে।

৭. যেসব পণ্য ক্রয় প্রতিনিধির কাছে ওকালতির ভিত্তিতে রয়েছে। এ ক্ষেত্রেও স্থানের বিবেচনায় দর নির্ণয় করে যাকাত দিতে হবে।

৮. ট্রেড মার্ক। বর্তমানে ট্রেড মার্কও একটি মূল্যমানসম্বলিত পণ্য হিসেবে বিবেচিত। তাই বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ট্রেড মার্ক নিলে এরও যাকাত আদায় করতে হবে।

৯. برامج الحاسوب সফটওয়্যার। বর্তমান সময়ে এটিও একটি বিক্রয়যোগ্য পণ্য। তাই ব্যবসার উদ্দেশ্যে তৈরীকৃত সফটওয়্যারের যাকাত আদায় করতে হবে।

১০. প্যাকেজিং, কার্টনজাতকরণের উপকরণ। যদি তা পণ্যের সাথে ক্রেতাকে দিয়ে দেওয়ার জন্য হয় এবং এর প্রভাব পণ্যের মূল্যের ওপর পড়ে তখন এসব উপকরণও যাকাতের আওতায় চলে আসবে।

১১. ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা জমি, ফ্ল্যাট, গাড়ি ইত্যাদি।

১২. ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে যেসব জমি, ফ্ল্যাট, পরিবহন ইত্যাদি ক্রয় করা হয় সেগুলোর যাকাত প্রদান করতে হবে না। তবে ভাড়া বাবদ যে অর্থ অর্জিত হবে, তা যাকাতের উপযোগী অন্যান্য আসবাবের সাথে যোগ হবে। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ৮/৪৬৮)

১৩. শেয়ার, শেয়ার ক্রয় Dividend-এর জন্য হলে দেখতে হবে ক্রয়কৃত শেয়ার-কোম্পানির কী পরিমাণ যাকাত উপযোগী ও অনুপযোগী সম্পদের প্রতিনিধিত্ব করে। যার পক্ষে এটা জানা সম্ভব সে শুধুমাত্র যাকাতের উপযোগী সম্পদ অনুপাতে যাকাত আদায় করবে। যার জন্য এটা জানা অসম্ভব সে সতর্কতামূলক বাজারদরে শেয়ারের যাকাত আদায় করবে।

আর শেয়ার দ্বারা Capital gain উদ্দেশ্য হলে এটি ব্যবসায়িক পণ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এর পূর্ণ মূল্যের যাকাত প্রদান করতে হবে। (ইসলাম আওর জাদীদ মাঈশত, পৃ. ৯৩-৯৪ আল মা'আঈর নং ৩৫, পৃ. ৪৭৫)

১৪. ব্যাংক হিসাব ও লকারে যেসব অর্থ ও যাকাত উপযোগী সম্পদ জমা থাকবে সেগুলোর যাকাতও প্রদান করতে হবে। সুদি ব্যাংকের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জমাকৃত অর্থের যাকাত দিতে হবে। এতে সুদ যোগ হবে না। তবে সমুদয় সুদ সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। ইসলামী ব্যাংকের ক্ষেত্রে জমাকৃত অর্থের সাথে মুনাফাও যোগ হবে। (আল মা'আঈর ৩৫)

১৫. বন্ড, অভিহিত মূল্যের সাথে খরচাপাতিও যোগ হবে। তবে অর্জিত মুনাফা সুদের অন্তর্ভুক্ত। বিধায় এতে যাকাত আসবে না। সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। (আল মা'আঈর ৩৫)

১৬. সব ধরনের বিনিয়োগ সুকুক, যতটুকু সম্পদের প্রতিনিধিত্ব করে সে অনুপাতে যাকাত দিতে হবে। (আল মা'আঈর ৩৫, পৃ. ৪৭৬)

১৭. স্বর্ণ-রুপার স্টক, আকার-আকৃতি যা-ই হোক না কেন।

১৮. Retention amount (মা'আঈর পৃ. ৪৭৬)

১৯. বায়নাপত্রে অগ্রীম যে অর্থের লেনদেন হয় এর যাকাত বিক্রেতাকে দিতে হবে। (মা'আঈর ৪৭৬)

২০. ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা পশু।

২১. সুকুকে মুকারাযা

২২. خيـــــار (option) কালীন পণ্যের যাকাত মালিকের ওপর ওয়াজিব। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ৮/৪৬৭)

২৩. বেচাকেনা সলম পদ্ধতিতে হলে মূল্যের যাকাত বিক্রেতা প্রদান করবে। ক্রেতার হস্তগত হওয়ার আগে পণ্যের বিধান ঋণের যাকাতের মতো। আর হস্তগত হওয়ার পর এর বিধান ব্যবসায়িক পণ্যের মতো। যদি এর দ্বারা ব্যবসা করাই উদ্দেশ্য হয়। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ৮/৪৬৯)

২৪. ইসতিসনা চুক্তির ক্ষেত্রে যাকাতের বিধান সলমের মতোই হবে। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ৮/৪৬৯)

২৫. ঋণের যাকাত

ক. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি ঋণ পরিশোধে সক্ষম হয়। অথবা অক্ষম কিন্তু ঋণের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান করে। কিংবা অস্বীকার করে কিন্তু পাওনাদারের কাছে শরয়ী প্রমাণ বিদ্যমান আছে। এমতাবস্থায় পাওনাদার ওই অর্থ ফেরত পাওয়ার পর হিসাব করে বিগত দিনসমূহের যাকাত আদায় করবে।

খ. আর যদি ঋণী ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করে কিংবা অস্বীকার করে এবং পাওনাদারদের নিকট কোনো শরয়ী প্রমাণও না থাকে। এমতাবস্থায় যদি কোনো সময় এই ঋণ পাওনাদারের হস্তগত হয় তাহলে হস্তগত হওয়ার পর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে এর যাকাত প্রদান করতে হবে। বিগত দিনের যাকাত দিতে হবে না।

(বাদায়েউস সানায়ে ২/১০, আদ্দুররুল মুখতার ও শামী ২/২৬৬-২৬৭ আল ফিক্বহুল ইসলামী ৮/৪৭২,২/৬৭৭)

২৬. সমুদ্র থেকে যেসব জিনিস আহরণ করা হয়। যেমন মাছ, মূল্যবান পাথর, হিরা, মুক্তা, ঝিনুক ইত্যাদি। ব্যবসার উদ্দেশ্যে এগুলো আহরণ করা হলে ব্যবসায়িক পণ্যের ন্যায় এগুলোরও যাকাত প্রদান করতে হবে।

২৭। ব্যবসার উদ্দেশ্যে যেসব গবাদিপশু লালন-পালন বা ক্রয় করা হয় ব্যবসায়িক পণ্যের ন্যায় বাজারদরে সেগুলোরও যাকাত আদায় করতে হবে।

২৮। গবাদিপশু ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। তবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে রাখা হলে এগুলোর ওপরও যাকাত ওয়াজিব হবে এবং ব্যবসায়িক পণ্যের ন্যায় যাকাত দিতে হবে।

২৯। ডেইরি ফার্মের গাভি এবং ডিমের ফার্মের মুরগি-হাঁস ও কোয়েলের যাকাত দিতে হবে না। তবে দুধ ও ডিম বিক্রি করে যা আয় হবে তার যাকাত দিতে

হবে। যদি যাকাত ওয়াজিব হওয়ার অন্যান্য শর্ত পাওয়া যায়।

৩০। বয়লার ফার্মের মোরগ এবং গরু, ছাগল মোটাতাজা করণের ফার্মের গরু-ছাগল ব্যবসায়িক পণ্যের অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসায়িক পণ্যের ন্যায় বাজারদরে এসব প্রাণীর যাকাত দিতে হবে। (আল মাআঈর নং ৩৫)

যাকাতের পরিমাণ

১. স্বর্ণে	২.৫%
২. রুপায়	২.৫%
৩. দেশি-বিদেশি মুদ্রা	২.৫%
৪. ব্যবসায়িক পণ্য	২.৫%

৫. ক্ষেতে উৎপাদিত শস্য ও ফলফলাদিতে ৫%বা ৭.৫% অথবা ১০%

৬। খনিজ সম্পদ ২.৫%

(আল মা'আঈর নং ৩৫)

হারাম মাল

ক. জাতিগত হারাম হলে, যেহেতু এটি শরীয়ত নিষিদ্ধ তাই এতে যাকাতের হুকুম জারি হবে না। যেমন : শূকর, মদ ইত্যাদি।

খ. বিশেষ কোনো কারণে হারাম। যেমন : স্বর্ণ-রুপার তৈরি মূর্তি। প্রকৃত মু'মীনের জন্য এর আকৃতি মিটিয়ে দিয়ে স্বর্ণ-রুপার যাকাত প্রদান করা জরুরি।

গ. অন্যায়ভাবে অর্জিত সম্পদ। যেমন : চুরি-ছিনতাই, ডাকাতি-হাইজ্যাক, সুদ-ঘুষ-দুর্নীতি, গান-বাদ্য করে উপার্জিত সম্পদ ও শরীয়ত কর্তৃক অসমর্থিত পন্থায় উপার্জিত অন্য কোনো সম্পদ, যেহেতু এই সম্পদগুলোর মালিক সে নয়, বিধায় তাকে এগুলোর যাকাত দিতে হবে না। বরং এ সম্পদ তার প্রকৃত মালিকের কাছে পৌঁছে দেওয়াই শরীয়তের বিধান। বিহিত কারণে সম্ভব না হলে পুরো সম্পদ সদকা করে দিতে হবে। (শামী ২/২৯০-২৯১, আল ফিক্বহুল ইসলামী ৮/৪৫৪)

সন্দেহজনক মাল

কোনো মালের ব্যাপারে হালাল নাকি হারাম এ মর্মে সন্দেহ হলে কোনো বিজ্ঞ আলেমে দ্বীনের সাথে আলোচনা করে সংশয়ের নিরসনের চেষ্টা করতে হবে।

যাকাতের অর্থ বিনিয়োগ করা

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাকাতের রুকন হলো উপযুক্ত কাউকে পরিপূর্ণভাবে মালিক বানিয়ে দেওয়া। সুতরাং যাকাতের অর্থ উপযুক্ত খাতে না দিয়ে লাভজনক কোনো প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে অর্জিত মুনাফা বিলিয়ে দিলেও যাকাত আদায় হবে না। (সূরা তাওবা ৬০)

যাকাতের অর্থে ট্যাক্স প্রদান

যাকাত ও ট্যাক্সের মধ্যে পার্থক্য আসমান-জমিনের। যাকাত নিখুঁত একটি ইবাদত। আর ট্যাক্স রাষ্ট্রের তরফ থেকে চাপিয়ে দেওয়া একটি জিনিস। অতএব, দুটিকে এক মনে করে যাকাতের অর্থ দ্বারা ট্যাক্স ও রাজস্ব আদায় করলে যাকাত আদায় হবে না। (শামী : ২/২৭০)

কোন দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে?

যেদিন আদায় করা হবে সেই দিনের পণ্য মূল্যের যাকাত আদায় করতে হবে। (শামী ২/২৮৬)

পণ্য আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে মালিকানা কখন লাভ হবে

কন্ট্রাক্ট F.O.B-এর ভিত্তিতে হলে মাল লোড হওয়ার সাথে সাথে মালিকানা স্বত্ব লাভ হবে। আর C.I.F-এর ভিত্তিতে হলে মাল বন্দরে পৌঁছার সাথে সাথে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ৮/৪৬৬)

যেসব জিনিসের যাকাত নেই

১. নিজেদের ব্যবহৃত ইমারত ভবন।

২. অফিশিয়াল যাবতীয় আসবাব।

৩. গুদামঘর।

৪. কাজের স্বার্থে যেসব জিনিস ক্রয় করা হয় । যেমন : এসি, ফ্যান, এয়ারকুলার, কম্পিউটার ইত্যাদি।

৫. কারিগরি স্বার্থে ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি।

৬. খুচরা যন্ত্রাংশ।

৭. কোম্পানির স্বার্থে ক্রয়কৃত মালবাহী বা মানুষবাহী পরিবহন।

৮. ভাড়া দেওয়ার জন্য ক্রয়কৃত প্লট, ফ্ল্যাট, গাড়ি বা অন্য কিছু।

৯. কোম্পানির ভবন বা দফতর নির্মাণের জন্য ক্রয়কৃত জমি।

১০. কার্টন, প্যাকেজিংজাতীয় আসবাব, যা শুধুমাত্র পণ্যের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্রয় করা হয়। বিক্রি বা পণ্যের সাথে ক্রেতাকে দেওয়ার জন্য নয়।

১১. পণ্য তৈরির ক্ষেত্রে যেসব জিনিস এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যায় যে, এর কোনো অস্তিত্ব বা নাম-গন্ধও অবশিষ্ট থাকে না। যেমন : জ্বালানি এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যবহৃত সাবান ইত্যাদি।

বি. দ্র. এ-জাতীয় পণ্যের যতটুকু বছরের শেষ দিন মজুদ থাকবে তা অবশ্যই যাকাতের আওতায় পড়বে। শুধুমাত্র যতটুকু ব্যবহার হবে, ততটুকুই বাদ যাবে। (মা'আঈর ৪৭৮)

১২. পাহারা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত কুকুর। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ২/৬৫১)

১৩. Charitable fund ও Trust

১৪. অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের মুনাফা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ওয়াজিব হবে না। (মা'আঈর ৪৭৩)

১৫. কোনো কন্ট্রাক্ট বাবদ যে অর্থ অগ্রিম প্রদান করা হয়। (মা'আঈর ৪৭৯)

১৬. ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত পশুর প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য।(পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত পশুর যাকাত প্রদান করতে হবে তবে ওই পশুসমূহের প্রয়োজনীয় খাদ্যের যাকাত দিতে হবে না।) (হিন্দিয়া ১/১৮০, আল মৌসু'আ ২৩/২৭৪)

যাকাত প্রদানের ক্ষেত্র বা 'মাসারিফ'

পবিত্র কোরআনে কারীমে আট ধরনের লোকদের যাকাত প্রদানের সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। যেমন : ইরশাদ হচ্ছে–

প্রকৃতপক্ষে সদকা ফকীর ও

মিসকীনদের হক এবং সেই সকল কর্মচারীর, যারা সদকা উসূলের কাজে নিয়োজিত এবং যাদের মনোরঞ্জন করা উদ্দেশ্য তাদের। তা ছাড়া দাস মুক্তিতে, ঋণগ্রস্তের ঋণ পরিশোধ এবং আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের সাহায্যেও তা ব্যয় করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রদত্ত বিধান। আল্লাহ জ্ঞানেরও মালিক, হিকমতেরও মালিক। (সূরা তাওবা ৬০)

কোরআনে উল্লিখিত আট ধরনের লোকদের মধ্যে এক প্রকার হলো অমুসলিমদের মনোরঞ্জনের জন্য যাকাত দেওয়া। হযরত উমর (রা.)-এর জামানায় ইসলামের ব্যাপকতা লাভ ও মুসলমানদের ব্যাপক শক্তি অর্জিত হওয়ার পর প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ায় অমুসলিমদেরকে যাকাত দেওয়ার বিধান রহিত করে দেন। ওই সময়ে সকল সাহাবায়ে কেরাম হযরত উমরের (রা.) এ সিদ্ধান্তে একমত পোষণ করেন। অবশিষ্ট থাকে সাত ধরনের লোক, তারা কারা? এর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. ফকির, ওই ব্যক্তি যার মালিকানায় যাকাতের নিসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকে, যদিও ওই ব্যক্তি কর্মক্ষম ও কর্মরতও হয়।

২. মিসকিন, ওই ব্যক্তিকে বলা হয় যার মালিকানায় কোনো ধরনের সম্পদ না থাকে।

উল্লেখ্য যে, নিজের মাতা-পিতা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি ফকীর-মিসকীন হলেও তাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে নিজের ভাই, বোন, চাচা, ফুফু, খালা, মামা, সৎমা, শ্বশুর, শাশুড়ি, জামাতাকে ফকীর বা মিসকীন হওয়ার শর্তে যাকাত দেওয়া যাবে।

৩. আ'মেল তথা যাকাতের মাল সংগ্রহকারী; ইসলামী হুকুমতের বাইতুল মাল কর্তৃক যাকাত সংগ্রহে নিয়োজিত কর্মকর্তাবৃন্দ। তাদেরকে সংগৃহীত যাকাতের সম্পদ থেকে বিনিময় প্রদান করা। উল্লেখ্য, বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যাকাত সংগ্রহে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে কমিশন হারে যাকাত থেকে বিনিময় প্রদান কোনোভাবেই শরীয়তসম্মত নয়।

৪. গোলাম অর্থাৎ বিনিময় প্রদান করে আজাদ হওয়ার জন্য গোলামকে যাকাত প্রদান করা। বর্তমানে এই খাতটিও বিদ্যমান নেই।

৫. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, কোনো ব্যক্তি এই পরিমাণ ঋণী হলে যে ঋণ আদায় করার পর তার কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে না।

৬. আল্লাহর রাস্তায় থাকা ব্যক্তি, যে সকল মুসলমান আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে এবং তাদের কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পদ না থাকলে।

উল্লেখ্য, অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম, ইমামগণের নিকট আল্লাহর রাস্তা বলতে নির্ধারিত খাতকে বোঝানো হয়েছে। তাই কোনো ইসলামী সংগঠন ও সংস্থা বা অন্য কোনোভাবে ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর রাস্তায় আছি মনে করে যাকাত নেওয়ার উপযুক্ত দাবি করার কোনো অবকাশ নেই।

৭. মুসাফির, কোনো ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও কোথাও সফরে এসে সম্পদ শূন্য হয়ে পড়লে, তাকে বাড়িতে পৌঁছতে পারে পরিমাণ যাকাত প্রদান করা। উল্লিখিত সব খাতে অথবা যেকোনো একটি খাতে যাকাত প্রদান করলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। এই খাতগুলো ছাড়া অন্য কোনো খাতে যাকাত প্রদান করলে যাকাত আদায় হবে না। চাই সেটি যতই ভালো কাজ হোক না কেন। তাই মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ, হাসপাতাল, রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ ইত্যাদি নির্মাণ এবং কোনো প্রকল্প যেখানে কোনো ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়–এমন খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করলে যাকাত আদায় হবে না। বরং তা পুনরায় আদায় করতে হবে।

সংশয় ও নিরসন

পূর্বের বিস্তারিত আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যাকাত প্রদানের ক্ষেত্র শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত। যাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'মাসারিফে যাকাত' বলা হয়। এটিও স্পষ্ট হয়েছে যে, যাকাত যাকে প্রদান করা হবে তাকে পরিপূর্ণ মালিক বানিয়েই দিতে হবে।

এ পর্যায়ে একটি সংশয়ের নিরসন প্রয়োজন। সেটি হলো বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, সংস্থা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাকাত সংগ্রহ করে থাকে। এর হুকুম কী হবে?

মূলত যে সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যাকাত সংগ্রহ করে থাকে তার মধ্যে কওমী মাদরাসাসমূহ অন্যতম। এ সকল মাদরাসায় যাকাত নেওয়ার উপযোগী বহু ছাত্র পড়ালেখা করতে আসে। তাদের জন্যই মূলত এই যাকাত সংগ্রহ করা হয়। এবং তা যথাযথ প্রক্রিয়ায় ওই সকল ছাত্রকে মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়।

মাদরাসা কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে যাকাত সংগ্রহ করে থাকে। তাই যে সকল মাদরাসা যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে যাকাতের অর্থ পৌঁছে দেয় সে সকল মাদরাসায় যাকাত দেয়ার দ্বারা যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

রয়ে গেছে অন্যান্য সংগঠন সংস্থা। সম্প্রতি বিভিন্ন সংগঠন এমনকি টিভি চ্যানেলও ইসলামের খেদমতের নামে যাকাতের অর্থ সংগ্রহ করতে দেখা যায়। অথচ তাদের কাছে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত যাকাতের কোনো ক্ষেত্র থাকা স্পষ্ট নয়। তাই ওই সকল সংগঠন ও প্রকল্পে যাকাত প্রদানে সতর্ক থাকা জরুরি।

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা
শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর
অমূল্য বাণী

আধ্যাত্মিক শেফার জন্য মোবারক মাস : রমাজান মাসে শয়তান বন্দি হয়ে যায় এবং প্রবৃত্তি একাকী রয়ে যায়। সুতরাং এখন তাকে রোযার মাধ্যমে বাধ্য করে নেওয়া সহজ।

যেমন শারীরিক অসুস্থতা দূর হওয়ার জন্য বিভিন্ন ক্লিনিক-হাসপাতালে রোগীকে একাকী রাখা হয় এবং সেখানে চিকিৎসার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে রোগী সুস্থ হয়ে উঠতে সহজ হয়। তেমনি রমজানুল মোবারক, এই মাসে শয়তানকে বন্দি করার কারণে নফস একাকী থাকে, ফলে এর চিকিৎসা সহজ হয়। সুতরাং এই মাসেই আধ্যাত্মিক চিকিৎসার দিকে মনোনিবেশ করা খুবই জরুরি।

রোযা একটি বিশেষ ইবাদত :

নামায যেমন দ্বীনের অন্যতম ভিত্তি, যাকাতও একটি ভিত্তি। তেমনি রোযাও দ্বীনের একটি ভিত্তি এবং বিশেষ ইবাদত। অন্যান্য ইবাদতে দেখা যায় এবং জানা যায়। যেমন যাকাত দেওয়ার সময় অবগত হওয়া যায় যে, যাকাত প্রদান করছে। হজের ইহরাম বাঁধলে বোঝা যায় হজ পালনার্থে যাচ্ছেন। নামাযের ব্যাপারে সেরূপ অবগত হওয়া যায়। কিন্তু রোযা রাখলে তা বোঝা যায় না। কেউ রোযা না রেখে যদি বলে, 'আমি রোযাদার' তবে মিথ্যুক বলার কোনো কায়দা নেই। রোযাদার হওয়া না হওয়া সেটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

ফলাফল দুটিই

রোযা তো তারাই রাখে, যাদের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা এবং ভয় থাকে। ফল তো দুটিই হয়ে থাকে। হয়তো কাজ করার মাধ্যমে আণ্ডা মিলবে নতুবা কাজ না করার কারণে ডাণ্ডা মিলবে। কাজ হবে দুই কারণে : মুহাব্বত অথবা ভয়ের কারণে। রোযা না রাখলে আল্লাহ তা'আলা নারাজ হন আবার শাস্তির কারণ হয়। সুতরাং হয়তো আল্লাহর ভালোবাসায় রোযা রাখবে যাতে আল্লাহ তা'আলা নারাজ না হন। অথবা শাস্তির ভয়ে রোযা রাখবে। কিছু লোক তো রোযা রাখে; কিন্তু কিছু কিছু গোনাহ হয়ে যায়। এতে বোঝা যায় তার মাঝে আল্লাহর মোহাব্বত ও ভয় অপরিপূর্ণ রয়েছে। যত পরিমাণ ভয় এবং ভালোবাসা প্রয়োজন, তত পরিমাণ বিদ্যমান থাকলে বন্দা গোনাহ করতে পারে না।

রোযার বৈশিষ্ট্য :

রোযার বৈশিষ্ট্যাবলির মধ্যে এও আছে যে, যার মাঝে আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসার কমতি আছে রোযার কারণে তা বৃদ্ধি পায়। ভক্তি ও মোহাব্বতের সাথে কাজ করলে ভক্তি ও মোহাব্বত বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক জিনিসের প্রভাব আছে। তেমনি রোযারও একটা প্রভাব থাকে। সুতরাং হিম্মত করে রোযা রাখো এবং গোনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করো। ইনশাআল্লাহ এর বরকতে শক্তি সঞ্চারিত হবে। যখন আল্লাহর ভক্তি, ভালোবাসা ও ভয় অন্তরে সৃষ্টি হয়ে যাবে মানুষের আর কী প্রয়োজন? মানুষ এভাবে আল্লাহর অলি হয়ে যায়। দ্বীনের মধ্যে মজবুতী এসে যাবে।

গোনাহ থেকে তৎক্ষণাৎ তাওবা করা :

অনেক সময় অজানা কারণে গোনাহ হয়ে যায়। তাই গোনাহ হওয়া মাত্রই তাওবা করে নেবে। দুই রাক'আত নামায পড়বে এবং তাওবা করবে। এটি খুবই উত্তম বিষয়। তেমনি রোযা রাখবে গোনাহ কম হবে। রোযার কারণে শক্তি বরকত অর্জিত হবে।

রোযার মাধ্যমে বিশেষ শক্তি অর্জিত হয়

কিছু লোক খুব গুরুত্ব দিয়ে রোযা রাখেন। গাড়ি চালান কিন্তু রোযা রাখেন। খুব মেহনত করে রিকশা চালান কিন্তু রোযা রাখেন। সেরূপ কৃষক-শ্রমিক অন্য পেশাজীবীরা রোযা রাখে। তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। এরূপ মেহনতী মানুষ রোযা রাখতে পারলে আমরা যারা সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করি তাহলে আমরা পারব না কেন? বরং রোযার মাধ্যমে বিশেষ শক্তি এসে যায়। পাপাচার থেকে বাঁচার সাহস এবং শক্তি অর্জিত হয়।

রমাজানে প্রত্যেক ভালো কাজের প্রতিদান বৃদ্ধি পায় :

রমাজান মাসে প্রত্যেক ভালো কাজের প্রতিদান ৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতে একেক হরফে ১০ নেকী পাওয়া যায়। যদি রমাজানে এই নেকী ৭০ গুণ বৃদ্ধি পায় তবে হিসাব করে দেখুন কতগুণ সাওয়াব বৃদ্ধি পাবে। একেক হরফে প্রায় সাতশ'র মতো সাওয়াব হবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি কত বড় উপহার! এবং কত বড় নিয়ামত! রমাজানের রোযা যখন শরীয়তের নীয়মনীতি মেনে রাখা হবে তবে আল্লাহর অলি হয়ে যেতে পারবে।

প্রত্যেক মানুষের দুটি দুশমন আছে :

উত্তম আমলকারী ব্যক্তির দুটি দুশমন আছে। একটি হলো শয়তান, সে বড় দুশমন! আরেকটি হলো নফস তথা প্রবৃত্তি। নফস যখন ঠিক হয়ে যায় তখন ইশারার ওপর চলতে থাকে। যেমন গাড়ি ইশারার ওপর চলে। তাতে একটি লাল বাতি থাকে আরেকটি সবুজ বাতি। লাল বাতি হলো নেতিবাচক ইশারা আর সবুজ বাতি হলো ইতিবাচক ইশারা। দেখুন! বছরের অন্য সময়ে মসজিদে কত মুসল্লি হাজির হয় আর রমাজান মাসে কত মুসল্লির ভিড় হয়। এটির একটি কারণ হলো, প্রথম দুশমনকে রমাজান মাসে বন্দি করা হয়। যখন প্রথম দুশমন বন্দিশালায় তখন দ্বিতীয় দুশমনকে কাবু করা সহজ। অর্থাৎ শরীয়তের যাবতীয় নিয়মনীতি মেনে রোযা রাখা হলে দ্বিতীয় দুশমন অচিরেই কাবু হেয় যাবে এবং সারা জীবনের জন্য সে তাবে হয়ে যাবে।

মাওয়ায়েযে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

মারকাযের ছাত্র-শিক্ষক ও বন্ধু-বান্ধবদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত

নেয়ামতের হিসাব দিতে হবে

বান্দার ওপর আল্লাহর বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য-অগণিত নেয়ামত রয়েছে, যা গুনতে চাইলেও শেষ করা যাবে না। এ ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন : وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها 'তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা শুরু করলেও তা গুনে শেষ করতে পারবে না।' অতএব বান্দার কাজ হলো, সব সময় নিজের রবের শোকরগুজারীতে লেগে থাকা এবং সার্বক্ষণিক এই আতঙ্কে থাকা যে, না জানি কোনো কারণে আল্লাহ আমার থেকে এসব নেয়ামত ছিনিয়ে নেন। আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতসমূহের মধ্য হতে কিছু নেয়ামত তো এমন যা দেখা যায়, অনুভব করা যায়। এগুলোকে নেয়ামত মনে করে বান্দা কম-বেশি এর শুকরিয়া আদায় করে, যেমন: আহার্য, পানীয়, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি। কিন্তু অনেক নেয়ামত এমন আছে, যেগুলো অতি মহান হওয়া সত্ত্বেও সেগুলো আল্লাহর নেয়ামত হওয়ার প্রতি মানুষের ভ্রূক্ষেপ নেই, ধ্যানও নেই। ফলে এসব নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার কখনো তাওফীক হয়ে ওঠে না, অথচ কিয়ামতের দিন এসব নিয়ামতের ব্যাপারেও জিজ্ঞাসা করা হবে। দুনিয়াতে এসব নিয়ামতের অবমূল্যায়ন করা হলে ও শুকরিয়া আদায় করা না হলে হাশরের ময়দানে সবার সামনে লাঞ্ছিত হতে হবে। যেমন এক হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন,

ان اول ما يسئل العبد يوم القيامة من النعم ان يقال الم نصح جسمك ونروك من الماء البارد

রোজ কিয়ামতে বান্দাকে সর্বপ্রথম আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। প্রশ্ন করা হবে, আমি কি তোমাকে শারীরিক সুস্থতা এবং জীবনরক্ষাকারী ঠাণ্ডা পানির নেয়ামত দান করিনি? বলো, তার কি শুকরিয়া আদায় করেছ?

আল্লাহর কিছু বান্দা আছেন, যাঁরা এসব নিয়ামতের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখেন এবং এগুলোকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করে শুকরিয়া আদায় করেন। কিন্তু অনেকেই এ ব্যাপারে অজ্ঞ। অনুমেয় ও বাহ্যিক নেয়ামত ছাড়াও স্বয়ং মানুষের নিজেদের অস্তিত্ব, শরীর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শরীরের প্রতিটি রোগ, সুস্থতা, জ্ঞান-বুদ্ধি, শৈশব, যৌবন, শক্তি-সামর্থ্য এমনকি প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস সব কিছুই আল্লাহর মহা নেয়ামত। যার কোনো একটি খুঁইয়ে গেলে বা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে গেলে জীবনের সব কিছুই ওলট-পালট হয়ে যায়। মানুষের শরীরের ভেতরগত অতি সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ যেগুলো মানুষের জীবনের ভীত সেগুলো আল্লাহর কত বড় নেয়ামত, এটা তখনই বুঝে আসে, যখন কোনো একটির ত্রুটির কারণে জীবন সংকটাপন্ন হয়। বান্দার চোখ তখনই খুলে যায় যে, এটাও তো আল্লাহর মহা নেয়ামত। এ ধরনের কিছু নেয়ামতের প্রতি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মতকে সতর্ক করে দিয়েছেন, যেগুলোর প্রতি মানুষ বেখবর থাকে, মূল্যায়ন করে না, শুকরিয়া আদায় করে না এবং হেলায়-খেলায় যেগুলোকে নষ্ট করে দেয়। অথচ কিয়ামতের দিন এসব নিয়ামতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। সঠিক উত্তর দিতে না পারলে নাজাত পাওয়া অসম্ভব। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم অতঃপর তোমাদেরকে অবশ্যই নেয়ামতসমূহের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন,

لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وماذا عمل فيما علم

পাঁচটি প্রশ্নের সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত কোনো আদম সন্তান হাশরের মাঠ থেকে এককদম পরিমাণও নড়তে পারবে না।

প্রশ্ন : ১

জিজ্ঞেস করা হবে, বলো–তোমার হায়াত কিভাবে কাটিয়েছ? মানুষের জীবন আল্লাহর একটি আমানত, যা বান্দাকে কিছুদিনের জন্য দান করেছেন, যেন এই আমানতকে তার প্রকৃত মালিক ও রবের মর্জি মোতাবেক পরিচালিত করে এবং ক্ষণস্থায়ী এই জীবন দ্বারা আখেরাতের স্থায়ী জীবনকে শান্তিময় করতে পারে। জীবন এ জন্য দেওয়া হয়নি যে, তাকে খেলাধুলায় শেষ করে দেবে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান এবং আল্লাহর নেয়ামত, এ ব্যাপারে আখেরাতে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

প্রশ্ন : ২

জিজ্ঞেস করা হবে, বলো–যৌবনকে কোথায় লাগিয়েছ? যৌবনে কী কী করেছ? যৌবনে মানুষের অনুভূতি জেগে ওঠে, শক্তি-সামর্থ্য থাকে ঊর্ধ্বমুখী। এ সময় মানুষের চিন্তা-চেতনা সঠিক পথে পরিচালিত হলে এবং যাবতীয় অপকর্ম থেকে বেঁচে সৎকর্ম সচ্চরিত্র গঠনে ও শরীয়তের বিধানাবলি পালনে

মনোনিবেশ করলে দুনিয়া ও আখেরাতে এ ধরনের যুবককে আল্লাহর রহমত ঢেকে নেবে। এক হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন,

سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله :الإمام العادل، وشاب نشأ فى عبادة ربه

কিয়ামতের দিন যখন সমস্ত সৃষ্টি হিসাব-নিকাশের ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার হবে, তখন সাত ধরনের ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা আরশের নিচে রহমতের ছায়ায় সম্মানের সাথে বসিয়ে রাখবেন। তাদের মধ্য হতে একজন ওই যুবক, যে তার যৌবনে আল্লাহর ইবাদতে লেগে থাকত।

দেখুন, জীবন সায়াহ্নে তো গুটিকয়েক হতভাগা ছাড়া সবাই আল্লাহর নাম নেয়, দ্বীনদার হয়ে যায়, দাড়ি রাখে, নামাযি বনে যায়, মসজিদে আসা-যাওয়া করে। কিন্তু পরিপূর্ণ বন্দেগী তো ভরা যৌবনে আল্লাহর ইবাদতে রত থাকার মধ্যেই নিহিত। যৌবন চিরস্থায়ী নয়, এটা একদিন শেষ হয়ে যাবে, বার্ধক্য অনিবার্য। এটি আসার আগেই যৌবনকে গণীমত মনে করো এবং এমন কাজে ব্যয় করো, যার মধ্যে দুনিয়া-আখেরাতের সফলতা লুকিয়ে রয়েছে। কারণ এই যৌবন সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করা হবে, যৌবন কোথায় কিভাবে ব্যয় করেছ?

প্রশ্ন : ৩

জিজ্ঞেস করা হবে, বলো–তুমি এই সম্পদ কোন পথে কিভাবে উপার্জন করেছ? মানুষ নিজের সুখ-শান্তি, ইজ্জত, সম্মান ও খ্যাতি অর্জনের জন্য না জানি কত পথে কতভাবে সম্পদ অর্জন করে এর কোনো ইয়ত্তা নেই। হালাল-হারামের কোনো পরোয়া নেই, প্রবৃত্তির তাড়নায় পার্থিব সুখ-শান্তির লালসায় সব কিছুই করে থাকে। মনে রাখবেন, সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন আনায় আনায় সেই সত্তার সামনে হিসাব দিতে হবে, যার অজ্ঞাতে কিছুই নেই।

প্রশ্ন : ৪

আরো জিজ্ঞেস করা হবে, উপার্জিত সম্পদ কোন খাতে ব্যয় করেছ? মানুষ মনে করে সম্পদ আমার মেহনত ও জ্ঞানের ফসল। অতএব যেখানে ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা খরচ করব। এ ধরনের মনোভাব মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়। মনে রাখবেন, হালাল মাল আল্লাহর নেয়ামত, উপার্জনের উপকরণ ও আল্লাহর দান। অতএব আল্লাহর নির্দেশিত পথেই এগুলো ব্যয় করতে হবে। হারাম খাতে ব্যয় করা এমনকি বৈধ ও মোবাহ খাতে প্রয়োজন ছাড়া মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় করাও অপচয়ের শামিল, যা মূলত আল্লাহর নিয়ামতের না শুকরি ও তার আজাব-গজবকে আহবান করার নামান্তর। এ ব্যাপারেও কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে।

প্রশ্ন : ৫

জিজ্ঞেস করা হবে, বলো–যা জানতে তদানুযায়ী কতটুকু আমল করেছ? আপনারা সবাই উলামায়ে কেরাম, এ প্রশ্নের সম্মুখীন আপনারাই হবেন। ভেবে দেখুন, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো প্রস্তুতি কে কতটুকু নিয়েছেন। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আখেরাতে, তবে কার্যক্ষেত্রে পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিতে হবে দুনিয়াতেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আলেমে বা আমল হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপটিক্যাল কোং

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।

পাইকারি ও খুচরা দেশি-বিদেশি চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫। ফোন : ০২-৯১১৩৮৫১

'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ

ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের দলিল

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর ছয়টি নাকি বারোটি–এ সম্পর্কে মাযহাবের ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ (রহ.)–এর মতে, ঈদের নামাযে বারো তাকবীর দিতে হবে। আর ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, উভয় ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর ছয়টি।

ছয় তাকবীরের দলিলের আলোচনার আগে জেনে নেওয়া উচিত যে, তাকবীরসংক্রান্ত ইমামদের এ ইখতেলাফ শুধু উত্তম অনুত্তম নিয়ে। অর্থাৎ যাঁরা বারো তাকবীরের কথা বলেন তাঁদের মতে ছয় তাকবীর দিলেও নামায হয়ে যাবে। কিন্তু বারো তাকবীর দেওয়া উত্তম। এমনিভাবে যাঁরা ছয় তাকবীরের কথা বলেন তাঁদের মতে বারো তাকবীর দিলেও নামায হয়ে যাবে। তবে উত্তম হলো, ছয় তাকবীর দেওয়া। কেননা উভয় পদ্ধতি সাহাবাদের আমল থেকে সহীহ সনদে সাব্যস্ত। তাই এক মত গ্রহণ করলে অপরটিকে তুচ্ছজ্ঞান করা যাবে না। এ সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বেশ সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেন : 'সালফে সালেহীন এর মধ্য থেকে প্রত্যেকেই শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে নামায, দু'আ, যিকির ইত্যাদি আদায় করেছেন। আর প্রত্যেক ইমামের ছাত্রগণ ও তার দেশবাসী উক্ত ইমামের অনুসৃত পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। কখনো প্রত্যেক ইমামের অনুসৃত পদ্ধতি (জায়েয ও উত্তম হওয়ার দিক দিয়ে) এক মানের হয়, আবার কখনো কারো অনুসৃত পদ্ধতি অপরের পদ্ধতি থেকে উত্তম হয়ে থাকে... এমন ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্য কর্তব্য হলো, শরীয়ত সমর্থিত দলিল ছাড়া একের মতকে অন্যের মতের ওপর প্রাধান্য না দেওয়া। তবে হ্যাঁ, দলিলে শরয়ীর ভিত্তিতে যদি কোনো এক পদ্ধতি প্রাধান্য লাভ করে সেটার ওপর আমল করা উচিত। এতদসত্ত্বেও কেউ অন্য কোনো জায়েয পদ্ধতির অনুসরণ করছে তাকে দোষারোপ করা যাবে না।' (আদাবুল ইখতিলাফ ১১৪ পৃ.)

এ হলো উত্তম-অনুত্তম পর্যায়ের মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর মতামত। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) আমাদের আহলে হাদীস বন্ধুদের কাছে মাননীয় ও বরণীয়। তা সত্ত্বেও তারা আজ নামাযসংক্রান্ত এমন সব উত্তম-অনুত্তম পর্যায়ের ইখতেলাফ নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু করছে যেসব ইখতেলাফ শত শত বছর পূর্বে মিটে গেছে। এসব ইখতেলাফী মাসআলা নিয়ে তারা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। সরল প্রাণ মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। ভারত উপমহাদেশ হানাফী মাযহাবের অনুসারী মুসলমানদের আবাসস্থল। এখানের মুসলমানদের অন্তরে হানাফী মাযহাবের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করাই বোধ হয় বর্তমান আহলে হাদীস বন্ধুদের অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব। লা-মাযহাবী বন্ধুদের পক্ষ থেকে প্রোপাগাণ্ডার শিকার একটি মাসআলা হলো ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের মাসআলা। আহলে হাদীস বন্ধুরা বলতে চায়, ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোনো হাদীস নেই, অথচ বারো তাকবীরের পক্ষে অনেক হাদীস আছে। তাই ঈদের নামাযে বারো তাকবীরই দিতে হবে। ছয় তাকবীর দিলে নামায হবে না।

আমরা ইনশাআল্লাহ ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের যথার্থতা উল্লেখ করে বারো তাকবীর সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলোর সমুচিত জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব, যাতে হানাফী মাযহাবের অনুসারী মুসলমান ভাইদের আস্থা হানাফী মাযহাবের ওপর অটুট থাকে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা আর কোনো হানাফী ভাইকে বিভ্রান্ত করতে না পারে।

জেনে নেওয়া উচিত যে, হাদীসের মধ্যে অতিরিক্ত ছয় তাকবীরকে বিভিন্নভাবে বোঝানো হয়েছে। কোনো হাদীসে ঈদের নামাযে নয় তাকবীর বলা হয়েছে। এমনিভাবে কোনো হাদীসে দুই রাক'আতে চারটি করে মোট আট তাকবীরের কথা এসেছে। কিন্তু কোনো ইমামই ঈদের নামাযে নয় বা আট তাকবীরের প্রবক্তা নন। তাহলে বোঝা গেল নয় বা আটের বিশেষ কোনো ব্যাখ্যা রয়েছে। মূল হাদীস উল্লেখ করার আগে সেই ব্যাখ্যা জেনে নিলে সামনের কথা বোঝা সহজ হবে।

একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, ঈদের নামাযের প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা, অতিরিক্ত তিন

তাকবীর ও রুকুর তাকবীরসহ মোট তাকবীর হয় পাঁচটি। আর তৃতীয় রাক'আতে অতিরিক্ত তিন তাকবীর ও রুকুর তাকবীরসহ তাকবীর হয় চারটি। অতএব ফলাফল দাঁড়াল ৫+৪=৯। হাদীসে যেখানেই নয় তাকবীরের কথা বলা হয়েছে, সেখানে নয় এর ব্যাখ্যা এটাই। অর্থাৎ দুই রাক'আতে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর আর দুই রাক'আতের রুকুর দুই তাকবীর এবং তাকবীরে তাহরীমার এক তাকবীরসহ মোট নয় তাকবীর। আর চার চার আট তাকবীরের ব্যাখ্যা হলো, প্রথম রাক'আতে রুকুর তাকবীর বাদ দিয়ে অতিরিক্ত তিন তাকবীর এবং তাকবীরে তাহরীমাসহ মোট তাকবীর চারটি। আর দ্বিতীয় রাক'আতে রুকুর তাকবীর ও অতিরিক্ত তিন তাকবীরসহ মোট তাকবীর চারটি। ফলাফল ৪+৪=৮। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী হাদীসের যেখানেই দুই রাক'আতে চারটি করে আট তাকবীরের কথা বলা হয়েছে, সেখানে মূলত অতিরিক্ত ছয় তাকবীরই উদ্দেশ্য; বাকিগুলো অন্য তাকবীর। এখন আমরা হাদীস উল্লেখ করছি :

১.

عن القاسم ابى عبد الرحمن قال : حدثنى بعض اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال :صلى بنا النبى صلى الله عليه وسلم يوم عيد فكبر اربعا واربعا ثم اقبل علينا بوجهه حين انصرف فقال :لاتنسوا كتكبير الجنائز واشار باصابعه وقبض ابهامه .رواه الطحاوى وقال هذا حديث حسن الاسناد.

'প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আবু আব্দুর রহমান কাসিম বলেন, আমাকে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একজন সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদের দিন আমাদের নামায পড়ান এবং চারটি করে তাকবীর দেন। নামায শেষে আমাদের দিকে তাকিয়ে ইরশাদ করেন 'ভুলো না যেন, তারপর হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল বন্ধ করে বাকি চার অঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করে বললেন, জানাযার তাকবীরের মতো (ঈদের নামাযেও প্রতি রাক'আতে চারটি করে তাকবীর)। ইমাম তহাবী (রহ.) এই হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (তহাবী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৭১)

২.

عن مكحول قال :أخبرنى ابوعائشة جليس لابى هريرةؓ ان سعيد بن العاص سأل أباموسى الاشعرى وحذيفةبن اليمانؓ كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر فى الأضحى والفطر؟ فقال ابوموسى :كان يكبر اربعا تكبيره على الجنائز فقال حذيفة :صدق فقال ابوموسى :كذالك كنت اكبر فى البصرة حيث كنت عليهم .قال ابو عائشة وانا حاضر سعيدبن العاص

'প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইমাম মকহুল দামেস্কী বলেছেন, আমাকে আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর একজন সঙ্গী আবু আয়েশা আল উমাবী জানিয়েছেন যে, (কুফার আমীর) সাঈদ ইবনুল আস আবু মুসা আশআরী ও হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাযি.) কে জিজ্ঞেস করেন, নবীজি (সা.) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরে কয় তাকবীর দিতেন? আবু মুসা উত্তরে বললেন, একেক রাক'আতে জানাযার তাকবীরের সমসংখ্যক (চার) তাকবীর দিতেন। হুযাইফা (রাযি.) আবু মুসা (রাযি.) কে সমর্থন করে বললেন, তিনি ঠিক বলেছেন। আবু মুসা (রাযি.) আরো বললেন, আমি যখন বসরার আমীর ছিলাম তখন আমি সেখানে এভাবে প্রতি রাক'আতে চার তাকবীর দিতাম। আবু আয়েশা বলেন, সাঈদ ইবনুল আসের এই প্রশ্নের সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। (সুনানে আবু দাউদ : ১/১৬৩, মুসনাদে আহমাদ :৪/৪১৬) সনদের বিবেচনায় হাদীসটি হাসান পর্যায়ের। হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা জানতে 'আসারুস সুনান : ৩১৫ পৃ. টিকা দ্রষ্টব্য। আর চার তাকবীরের উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা যে তিন তাকবীর তা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।)

৩.

عن كردوس قال :كان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يكبر فى الاضحى والفطر تسعا تسعا .يبدأ فيكبر اربعا ثم يقرأ ثم يكبر واحدة فيركع بها ثم يقوم فى الركعة الاخرة فيبدأ فيقرأ ثم يكبر اربعا يركع باحداهن .قال الهيثمى :رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات.

'বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত কুরদূস (রহ.) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের নামাযে নয়টি করে তাকবীর দিতেন। নামায শুরু করে চারটি তাকবীর দিতেন (তিনটি অতিরিক্ত আর একটি তাহরীমার) তারপর কেরাআত পড়তেন। অতঃপর এক তাকবীর বলে রুকু করতেন। এরপর দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে কেরাআত পড়ে আবারো মোট চারটি তাকবীর দিতেন যার একটি দিয়ে রুকু করতেন।' এই হাদীস সম্পর্কে হাফেজে হাদীস আল্লামা হাইছামী (রহ.) বলেন, এই হাদীসের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। (মাজামাউয্যাওয়ায়েদ ২/৩৬৭ হা. নং ৩২৪৯)

অতএব, হায়ছামী (রহ.)-এর উক্তি অনুযায়ী হাদীসটি সহীহ। আর আল্লামা

নিমাভী (রহ.) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, হাসান ও সহীহ উভয় প্রকারের হাদীসই আমলের ক্ষেত্রে একই পর্যায়ের গ্রহণযোগ্য।

৪.

عن علقمة والاسود قالا :كان ابن مسعود جالسا وعنده حذيفة وابوموسى رضى الله عنهم فسألهم سعيد بن العاص عن التكبير فى صلاة العيد فقال حذيفة سل الاشعرى ,فقال الاشعرى سل عبد الله فانه اقدمنا واعلمنا, فسأله ,فقال ابن مسعود يكبر اربعا ثم يقرأ ثم يكبر فيركع فيقوم فى الثانية فيقرأ ثم يكبر اربعا بعد القراءة.

'আলকমা ও আসওয়াদ (রহ.) বলেছেন, একদা ইবনে মাসউদ, হুযাইফা ও আবু মূসা আশআরী (রা.) বসেছিলেন। তখন সাঈদ ইবনুল আস তাঁদের নিকট ঈদের নামাযে তাকবীরের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে হুযাইফা (রা.) বললেন, আশআরী ভাইকে জিজ্ঞেস করো। আর আবু মূসা আশআরী (রা.) বললেন, ইবনে মাসউদ (রা.)কে জিজ্ঞেস করো, কেননা তিনি আমাদের মধ্যে প্রবীণ ও বেশি ইলমের অধিকারী। সর্বশেষে সাঈদ ইবনুল আস ইবনে মাসউদ (রা.)কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, নামায শুরু করে চারটি তাকবীর দেবে (তাকবীরে তাহরীমাসহ অতিরিক্ত তিনটি) তারপর কেরাআত পড়ে তাকবীর দিয়ে রুকুতে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে প্রথমে কেরাআত পড়বে তারপর চারটি তাকবীর দেবে (অতিরিক্ত তাকবীর তিনটি আর রুকুর একটি)। মুহাল্লা বিল আসার ৩/২৯৫, ইবনে হাযাম যাহেরী ও নিমাভী (রহ.) এই হাদীসের সনদকে সহীহ বলেছেন। (মুসান্নাফে অব্দুর রাজ্জাক হা. ৫৬৮৭ আছারুস সুনান পৃ. ৩১৫)

৫.

عن عبد الله بن الحارث (هو ابن نوفل) قال :كبر ابن عباس رضى الله عنه يوم العيد فى الركعة الاولى اربع تكبيرات ثم قرأ ثم ركع ثم قام فقرأ ثم كبر ثلاث تكبيرات سوى تكبيرة الصلاة. (اخرجه ابن حزم الظاهرى فى المحلى بالاثار ৩/২৯৫دارالكتب .وقال فى سند هذا الاثر و الاثر الذى قبله :هذان اسنادان فى غاية الصحة و به تعلق ابوحنيفة رحمه الله)

'আব্দুল্লাহ বিন হারেস বিন নাওফেল বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ঈদের দিন প্রথম রাক'আতে চারটি তাকবীর দেন (অতিরিক্ত তিনটি ও রুকুর একটি)। অতঃপর কেরাআত পড়েন, এরপর রুকু করেন। দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে প্রথমে কেরাআত পড়লেন এরপর নামাযের অন্যান্য তাকবীর ছাড়া অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর দিলেন।' ইবনে হাযাম (রহ.) এই হাদীসটি এবং এর পূর্বে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে বলেন, 'এই উভয় হাদীসের সনদ খুব সহীহ।' ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর দ্বারাই দলিল দেন।' (মুহাল্লা বিল আছার ৩/২৯৫)

৬.

اخرج ابن ابى شيبة عن يحيى بن سعيد القطان عن اشعث عن محمد بن سيرين عن انس رضى الله عنه انه كان يكبر فى العيد تسعا...

'ইবনে আবী শাইবা ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান থেকে তিনি আশআছ থেকে তিনি মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস (রা.) ঈদের নামাযে মোট নয় তাকবীর দিতেন।' (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১/৪৯৫)

এই আছারের রাবী ইবনে আবী শাইবা, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান এবং মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন সকলেই সুপ্রসিদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস। আর আশআছ সম্পর্কে ইমাম জামালুদ্দীন মিয্যী (রা.) বলেন :

هواشعث بن عبد الملك ,قال يحيى بن سعيد :هو عندى ثقة مامون ,وقال ابن معين :اشعث ثقة وكذالك قال النسائى ,وقال ابوحاتم :لابأس به.

'তাঁর পিতার নাম আব্দুল মালেক। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রা.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি আমার মতে নির্ভরযোগ্য ও আস্থাশীল। ইবনে মাঈন (রহ.) বলেন, আশআছ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, ইমাম নাসাঈ ও তাঁর সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছেন। আর ইমাম আবু হাতেম (রহ.) বলেছেন, (হাদীসের ক্ষেত্রে) তাঁর মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামাল : ২/২৭৯) এই আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয়, এই হাদীসটিও সহীহ।

৭.

أخرج ابن ابى شيبة عن ابى اسامة عن سعيدبن عروبة عن قتادة عن جابربن عبد الله و سعيد بن المسيب انهما قالا : تسع تكبيرات ويوالى بين القراءة

'হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) এবং সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহ.) (তিনি তাবেয়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) বলেন, ঈদের নামাযে মোট নয়টি তাকবীর হবে। আর উভয় রাক'আতে কেরাআত অবিচ্ছিন্ন ধারায় হবে। (অর্থাৎ উভয় রাক'আতের কেরাআতে মাঝে কোনো অতিরিক্ত তাকবীর হবে না।) (মুসান্নাফে

ইবনে আবী শাইবা : ৪/২১৬)
এই হাদীসের রাবী সাঈদ ইবনে আবী আরুবা এবং কাতাদা সুপ্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। আর আবু উসামা সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেছেন, 'তিনি শীর্ষস্থানীয়দের একজন' ইমাম আহমদ ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেছেন, 'তিনি নির্ভরযোগ্য'। (সিয়ারু আ'লামিননুবালা : ৮/১৭৬) অতএব, এই হাদীসটির সনদও সহীহ।

৮.
عن عبد الله بن الحارث قال شهدت ابن عباس كبر فى صلوة العيد بالبصرة تسع تكبيرات و والى بين القرائتين . قال وشهدت المغيرة بن شعبة فعل مثل ذالك

তাবেয়ী হযরত আব্দুল্লাহ বিন হারেস বর্ণনা করেন যে, আমি বসরায় ইবনে আব্বাস (রা.) কে ঈদের নামাযে মোট নয়টি তাকবীর দিতে দেখেছি এবং তিনি উভয় রাক'আতের কেরাআত অবিচ্ছিন্নভাবে আদায় করেছেন। আর মুগীরা বিন শু'বাহ (রা.) কেও আমি এরূপ করতে দেখেছি। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক : ৩/২৯৪, হাফেজ ইবনে হাজার আসকলানী (রহ.) এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। দেখুন, দেরায়া : ১/১১০)

উল্লেখ্য, এ উভয় হাদীসে নয় তাকবীরের মধ্যে ছয়টি অতিরিক্ত আর তিনটি নামাযের স্বাভাবিক তাকবীর। যেমন শুরুতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ঈদের নামাযে ছয় তাকবীর সম্পর্কে আরো কিছু আসার পাওয়া যায়, যা সংক্ষেপ করণার্থে আমরা এখানে উল্লেখ করলাম না। তবে যেসব সাহাবায়ে কেরাম (রা.) থেকে ছয় তাকবীরের আমল সহীহ সনদে প্রমাণিত তাদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১.হযরত উমর (রা.) (শরহু মাআনিল আসার : ১/৩১৯)
২. হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রা.)
৩. হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)
৪. হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.)
৫. হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা.
৬. হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)
৭. হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান (রা.)
৮. হযরত মুগীরা বিন শু'বাহ (রাযি.)
৯. হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাযি.) (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক : ৩/২৯১)
১০. হযরত বারা বিন আযেব (রাযি.)
১১. হযরত হাজ্জাজ বিন মালেক
১২. হযরত আবুত তুফায়েল আমের বিন ওয়াসেলা
১৩. হযরত আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ
১৪. হযরত ইমরান বিন হুসাইন
১৫. হযরত আবু রাফে (রাযি.)
১৬. হযরত আবু উমাম আল বাহেলী

বি. দ্র. ১০-১৬ পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর শাগরেদ। আর ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.) থেকে সহীহ সনদে সাব্যস্ত রয়েছে যে, 'আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.)-এর শাগরেদগণ ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর দিতেন।' (দেখুন, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৪/২২০)

বিশিষ্ট যেসব তাবেয়ী হযরাত ছয় তাকবীরের ওপর আমল করতেন

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) থেকে বর্ণিত : তাবেয়ীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তিনজন :

১. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব
২. আলকমা বিন কায়েস
৩. আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ (আততাকয়ীদ ওয়াল ঈযাহ পৃ. ২৫৫)। এ তিনজনই ছয় তাকবীরের ওপর আমল করতেন।
৪. কতাদা বিন দিআমা
৫. আবু কিলাবা
৬. আবু জা'ফর (রহ.) (দেখুন মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৪/২১৭ শায়েখ আওয়ামার তাহকীক)

মারফূ হাদীস, আসারে সাহাবা এবং আসারে তাবেঈন দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীরের বিষয়টি গ্রহণযোগ্য সনদে নবীজি (সা.) এবং সাহাবা কেরাম (রাযি.) থেকে প্রমাণিত। এতদসত্ত্বেও যারা ছয় তাকবীর নিয়ে মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তারা মূলত মুসলিম সমাজে অনৈক্য, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজে ইহুদী-খ্রিস্টানদেরকে সাহায্য করছে।

বারো তাকবীরের পক্ষে লা-মাযহাবী বন্ধুরা যেসব হাদীস পেশ করে থাকেন তার পর্যালোচনা

عن كثير بن عبد الله عن ابيه عن جده ان النبى صلى الله عليه وسلم كبر فى العيدين فى الاولى سبعا قبل القراءة وفى الاخرة خمسا قبل القراءة

১. কাসীর ইবনে আব্দুল্লাহ স্বীয় সূত্রে নবীজি (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবীজি (সা.) উভয় ঈদের প্রথম রাক'আতে কেরাআতের পূর্বে সাত তাকবীর দিতেন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে কেরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন। (সুনানে তিরমিযী : ১/১১১)

সনদ সম্পর্কে আমাদের কথা : এ হদীসটি কাসীর বিন আব্দুল্লাহ (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত। আমরা কাসীর বিন আব্দুল্লাহ সম্পর্কে রিজাল শাস্ত্রবিদ

ইমামদের মন্তব্য তুলে ধরছি। যাতে বোঝা যায় যে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য কি না?

ইমাম আহমাদ (রহ.) কাসীর সম্পর্কে বলেন,

منكر الحديث ليس بشيء

'তার হাদীস প্রত্যাখ্যাত, তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।' রিজাল শাস্ত্রের আরেক দিকপাল ইয়াইইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তানও তার সম্পর্কে ليس بشيء বলে মন্তব্য করেছেন। ইমাম শাফেয়ী কাসীর সম্পর্কে বলেছেন, ذاك احد الكذابين 'সে একজন মিথ্যুক।' ইমাম আবু যুরআহ বলেছেন, واهى الحديث ليس بقوى 'সে মনগড়া হাদীস বয়ান করে আর সে অতি দুর্বল বর্ণনাকারী'। ইমাম নাসাঈ ও দারাকুতনী (রহ.) বলেছেন, متروك الحديث 'তার হাদীস পরিত্যাজ্য।' (দেখুন তাহযীবুত তাহযীব : ৬/৫৫৮)

হাদীস বিশারদ ও রিজাল শাস্ত্রবিদ ইমামগণের মন্তব্য দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কাসীর বিন আব্দুল্লাহ একজ অগ্রহণযোগ্য রাবী। তার সূত্রে বর্ণিত হাদীস প্রমাণ উপযুক্ত নয়। অতএব, এ হাদীসটি বারো তাকবীর প্রমাণের উপযুক্ত নয়।

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه صلى صلاة العيد فكبر فى الاولى سبعا وفى الثانية خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة .سنن البيهقى৩/৪১২:

১. হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ঈদের নামায পড়ার সময় প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর দিলেন আর দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর দিলেন এবং প্রত্যেক তাকবীরের সাথে হাত উঠালেন। (সুনানে বাইহাকী : ৩/৪১২)

আমাদের কথা : হযরত উমর (রা.)-এর আমল সম্পর্কে বর্ণিত এই আসারের সনদে ইফরীকী নামক একজন রাবী রয়েছেন। যাঁর মূল নাম আব্দুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনউম। এই ইফরীকী সম্পর্কে আলী ইবনুল মাদীনী (রহ.) বলেছেন, ضعف يحيى الافريقى 'ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রহ.) ইফরীকীকে যয়ীফ বলেছেন।' আর আব্দুর রহমান বিন মাহদী ইফরীকী সম্পর্কে বলেছেন, اما الافريقى فما ينبغى ان يروى حديثا عنه 'আর ইফরীকী, সে তো এমন যে তার থেকে একটি হাদীসও বর্ণনা করা উচিত নয়।' ইমাম আহমাদ তার সম্পর্কে বলেছেন, ليس بشيء 'তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।' ইমাম নাসাঈ তাকে 'যয়ীফ' বলেছেন। (তাহযীবুত তাহযীব : ৫/৮৬)

হাদীস শাস্ত্রের এসব বিদগ্ধ ইমামদের মন্তব্য দ্বারা সাব্যস্ত হল যে, ইফরীকী একজন 'যয়ীফ' রাবী। অতএব, তার সূত্রে বর্ণিত হযরত উমর (রা.)-এর আমল সম্পর্কীয় আসারটি দলিলযোগ্য হতে পারে না।

তা ছাড়া হযরত উমর (রা.) থেকে ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের ওপর আমল সুপ্রমাণিত। ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, নবীজি (সা.)-এর ইন্তিকালের পর এ নিয়ে মতভেদ দেখা দিল যে, জানাযার নামাযে তাকবীর সংখ্যা কত হবে চার, পাঁচ? নাকি সাতটি? এই মতভেদ নিরসনে হযরত উমর (রা.) নিজ খেলাফতকালে সাহাবায়ে কেরামকে একত্র করে বললেন, 'আপনারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবী। কোনো বিষয়ে আপনাদের মতৈক্য বা মতানৈক্য পরবর্তীদের মধ্যে মতৈক্য বা মতানৈক্য সৃষ্টি করবে। তাঁর এ কথা শুনে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমীরুল মুমিনীন আপনি ঠিক বলেছেন। আলোচিত বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত আমাদেরকে বলুন। উমর (রা.) বললেন, বরং আপনারা আপনাদের মতামত বলুন, কেননা আমিও আপনাদের মতোই একজন মানুষ। এরপর সাহাবায়ে কেরাম পরস্পর মতবিনিময় করলেন এবং এ বিষয়ে একমত হলেন যে, যেভাবে ঈদুল ফিতির ও ঈদুল আযহায় চার চার তাকবীর হয়ে থাকে সেভাবে জানাযার নামাযেও চার তাকবীর হবে। (শরহু মাআনিল আসার : ১/৩১৯)

বি.দ্র. ঈদ ও জানাযার তাকবীরের ব্যাপারে নবীজি (সা.) থেকে বিভিন্ন রকম আমল পাওয়া যায়। তবে এ কথা ঠিক যে, নবীজি (সা.)-এর শেষ আমল ছিল চার চার তাকবীর। যে চারটির তিনটি অতিরিক্ত হবে। এজন্যই এ ব্যাপারে সকলে একমত হয়ে গেলেন।

এই হাদীস দ্বারা এ কথা বোঝা গেল যে, ঈদের নামাযে প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমাসহ চার তাকবীর হওয়া একটি স্বীকৃত বিষয় ছিল। যার কারণে জানাযার তাকবীরের সমাধান ঈদের তাকবীরের সাথে তুলনা করে করা হলো। এই ঘটনা দ্বারা এ কথাও বুঝে আসে যে, হযরত উমর (রা.)সহ ওই মজলিসে উপস্থিত সকল সাহাবায়ে কেরামই দুই ঈদে ছয় তাকবীরের প্রবক্তা ছিলেন।

অতএব, হযরত উমর (রা.) থেকে বারো তাকবীর সম্পর্কে বর্ণিত আসার সম্পর্কে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, দুই কারণে উক্ত আসার গ্রহণযোগ্য নয়। ১. এই আসারের রাবী ইফরীকী যয়ীফ ২. হযরত উমর (রা.) থেকে দুই ঈদে ছয় তাকবীর প্রমাণিত।

عن عائشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يكبر فى العيدين سبعا و خمسا قبل القراءة .

৩. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবীজি (সা.) উভয় ঈদের নামাযে কেরাআতের পূর্বে সাতটি ও পাঁচটি করে তাকবীর দিতেন। (মুসনাদে আহমাদ : ৬/৬৫)

عن عمروبن العاص رضى الله قال قال النبى صلى الله عليه وسلم التكبير فى الفطر سبع فى الاولى وخمس فى الاخرة القراءة بعدهما كلتيهما

৪. হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত নবীজি (সা.) বলেছেন, ঈদুল ফিতিরের প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর আর দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর। উভয় রাক'আতে তাকবীরের পরেই কেরাআত। (সুনানে আবু দাউদ : ১/১৬৩)

৩ ও ৪ নং হাদীস সম্পর্কে আমাদের কথা : গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুদের অনুসৃত ইমাম ইবনে হাযাম (রহ.) স্বীয় কিতাব মুহাল্লা বিল আসার-এ হযরত আয়েশা ও আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস দুটি উল্লেখ করার পর বলেন, وهذا كله لا يصح 'এ দুটির একটিও সহীহ নয়'। (দেখুন, মুহাল্লা বিল আসার : ৩/২৯৬)

তা ছাড়া হযরত আয়েশা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিকে বুখারী (রহ.)ও যয়ীফ আখ্যা দিয়েছেন। (প্রাগুক্ত-টিকা দ্রষ্টব্য।) আর ইমাম আবু আব্দুল্লাহ হাকেম নিশাপুরী (রহ) এ উভয় হাদীসের সনদকে 'ফাসেদ' বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী (রহ.) তা সমর্থন করেছেন। (দেখুন : আল মুস্তাদরাক : ১/২৯৮)

عن نافع انه قال شهدت الاضحى والفطر مع ابى هريرة فكبر فى الركعة الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفى الاخرة خمس تكبيرات قبل القراءة

৫. নাফে (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা.)-এর সাথে ঈদুল ফিতির এবং ঈদুল আযহা পড়েছি। তো তিনি প্রথম রাক'আতে কেরাআতের পূর্বে সাত তাকবীর দিলেন আর দ্বিতীয় রাক'আতে কেরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিলেন। (মুআত্তা ইমাম মালেক : ১/২৩৯)

আমাদের কথা : আবু হুরায়রা (রা.)-এর আমল সম্পর্কীয় এই আসারটির সনদ সহীহ। এই একটিমাত্র আসার ছাড়া বারো তাকবীর সম্পর্কীয় অন্য সব মরফূ এবং গায়রে মারফূ হাদীস যয়ীফ তথা প্রমাণযোগ্য নয়। ইমাম আহমাদ বারো তাকবীরের প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও বলেছেন,

ليس يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى تكبير العيدين حديث صحيح

ঈদের নামাযে তাকবীর সংখ্যা সম্পর্কে কোনো সহীহ মারফূ হাদীস নেই।'

(নসবুর রায়াহ : ৩/২৮৯, উল্লেখ্য, ছয় তাকবীরের পক্ষে উল্লিখিত মারফূ হাদীসগুলো হাসান পর্যায়ের। অতএব, ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর এ কথা দ্বারা আমাদের দলিল খণ্ডন হয় না।)

এখানে কয়েকটি বিষয় বোঝার রয়েছে, যথা : ক. আবু হুরায়রা (রা.)-এর আমলটি স্বয়ং নবীজি (সা.)-এর সুস্পষ্ট ঘোষণাও হুকুমের খেলাফ (আমাদের দলিলের ১ম হাদীস দেখুন)। আর নবীজি (সা.)-এর হুকুমের বরখেলাফ কোনো সাহাবীর আমল গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ হতে পারে ওই ব্যাপারে নবীজি (সা.)-এর হুকুম তিনি জানতে পারেননি। এমন অনেক ঘটনা হাদীসের কিতাবে বিদ্যমান।

খ. অথবা কোনো এক জমানায় নবীজি (সা.) বারো তাকবীরে ঈদের নামায পড়িয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তা তরক করে ছয় তাকবীরে ঈদের নামায পড়িয়েছেন। আর এ খবর হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর নিকট পৌঁছেনি। তাই তিনি প্রথম যুগের বারো তাকবীরের ওপর আমল করেছেন। নবীজি (সা.)-এর সর্বশেষ আমল জানা থাকলে কখনো তিনি তার খেলাফ করতেন না।

গ. আবু হুরায়রা (রা.)-এর আমলটি বড় বড় সাহাবায়ে কেরামের আমলের খেলাফ। এমতাবস্থায় বড় বড় সাহাবার আমল বাদ দিয়ে শুধু তার একার আমল গ্রহণ করা উচিত হবে না।

ঘ. এই তাকবীরগুলো নামাযের অংশ নয়, বরং অতিরিক্ত জিনিস। আর শরীয়তের নীতি হলো, অতিরিক্ত জিনিস নামাযে দাখেল করতে হলে তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হতে হবে। তো ছয় ও বারো তাকবীরের ইখতিলাফের মধ্যে ছয় তাকবীর নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত। কারণ যাঁরা বারো তাকবীরের কথা বলেন তাঁরাও ছয় তাকবীরকে মানেন। কেননা বারোর মধ্যে ছয় আছে। কিন্তু বারো তাকবীরের বিষয়টি এমন নয়। কেননা বারো তাকবীরকে সকলে স্বীকার করে না। বরং ছয় তাকবীরের প্রবক্তাগণ প্রকারান্তরে বারো তাকবীরকে অস্বীকার করেন। অতএব, অনিশ্চিত বিষয়কে নামাযের মধ্যে দাখেল করা উচিত হবে না। তাই আমরা এ কথা বলতে পারি যে, হানাফীদের আমল সকল দিক বিবেচনায় মজবুত এবং সহীহ।

শবেকদর, সাদকাতুল ফিতর, ঈদ

ফাজায়েল ও মাসায়েল

মুফতী নূর মুহাম্মদ

লাইলাতুল কদরের গুরুত্ব :

এ রাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, আল্লাহ তা'আলা এ রাত সম্পর্কে একটি পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ করেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত পঠিত হতে থাকবে।

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (٥)

'নিশ্চয় আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি এক মহিমান্বিত রজনীতে। আর মহিমান্বিত রজনী সম্পর্কে তুমি কি জানো? মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে রাতেই ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। শান্তিই শান্তি, সে রজনী ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত।'

এ সূরাতে যে সকল বিষয় জানা গেল তা হলো–

☆ এ রাত এমন এক রজনী, যাতে মানবজাতির হিদায়াতের আলোকবর্তিকা মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন মজীদ অবতীর্ণ হয়েছে।

☆ এ রজনী হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ তিরাশি বছরের চেয়েও এর মূল্য বেশি।

☆ এ রাতে ফেরেশতাগণ রহমত, বরকত ও কল্যাণ নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে থাকেন।

☆ এ রজনী শান্তির রজনী। আল্লাহর বান্দারা এ রাতে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে শান্তি অর্জন করে থাকে।

☆ সময়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। এ আয়াতগুলোতে অল্প সময়ে বেশি কাজ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যত সময়, তত বেশি কাজ করতে হবে। সময় নষ্ট করা চলবে না।

☆ গোনাহ ও পাপ থেকে ক্ষমা লাভ। এই রাতের ফজীলত সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : 'যে লাইলাতুল কদরে ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে নামায আদায় ও ইবাদত-বন্দেগী করবে তার অতীতের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।' (বুখারী শরীফ ১২৬৬)

লাইলাতুল কদর কখন?

পবিত্র কোরআনে নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি লাইলাতুল কদর কোনটি। তবে কোরআনের ভাষ্য হলো, লাইলাতুল কদর রমাজান মাসে। কিয়ামত পর্যন্ত রমাজান মাসে লাইলাতুল কদর অব্যাহত থাকবে এবং এ রজনী রমাজানের শেষ দশকে হবে বলে হাদীসে এসেছে এবং তা রমাজানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে হাদীসে বর্ণিত।

'তোমরা রমাজানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করো।' (বুখারী শরীফ ২০২০)

অধিকতর সম্ভাবনার দিক দিয়ে প্রথম হলো, রমাজান মাসের সাতাশ তারিখ। দ্বিতীয় হলো, পঁচিশ তারিখ। তৃতীয় হলো, ঊনত্রিশ তারিখ। চতুর্থ হলো, একুশ তারিখ। পঞ্চম হলো, তেইশ তারিখ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ রাতকে গোপন রেখেছেন আমাদের ওপর রহম করে। তিনি দেখতে চান এর বরকত ও ফজীলত লাভের জন্য কে কত প্রচেষ্টা চালাতে পারে।

লাইলাতুল কদরে আমাদের করণীয় হলো বেশি করে দু'আ করা। হযরত আয়েশা (রা.) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন, লাইলাতুল কদরে আমি কী দু'আ করতে পারি? তিনি বললেন, এই দু'আ করে–

اَللّٰهُم إِنَّكَ عَفُوٌّ تحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ

'হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমাশীল। ক্ষমাকে ভালোবাসেন, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন।' (ইবনে মাজাহ ১৯৮২)

সাদকাতুল ফিতরের বিধান

হাদীসে এসেছে–

'ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রোযাদারের জন্য সাদকাতুল ফিতর আদায় অপরিহার্য করে দিয়েছেন, যা রোযাদারের অনর্থক, অশ্লীল কথা ও কাজ পরিশুদ্ধকারী ও অভাবী মানুষের জন্য আহারের ব্যবস্থা হিসেবে পরিগণিত। যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বে এটা আদায় করবে তা সাদকাতুল ফিতর হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। আর যে ঈদের নামাযের পর আদায় করবে তা অপরাপর (নফল) সাদকা হিসেবে গৃহীত হবে।' (আবু দাউদ ১৩৭১)

☆ সাদকাতুল ফিতর কার ওপর ওয়াজিব?

ওই ব্যক্তির ওপর সাদকাতুল ফিতর

ওয়াজিব, যে ঈদের দিন ভোরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ হিসাবে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা সমপরিমাণ সম্পদের মালিক হবে। যার ওপর সাদকাতুল ফিতর ওয়াজিব তিনি নিজের পক্ষ থেকে যেমন আদায় করবে, তেমনি নিজের পোষ্যদের পক্ষ থেকেও আদায় করবেন।

☆ সাদকাতুল ফিতরের পরিমাণ :

গম ও আটার হিসাবে অর্ধ সা' (১৬৫০ গ্রাম) অথবা তার সমমূল্য। খেজুর, কিশমিশ, জবের হিসাবে এক সা' (৩৩০০ গ্রাম) অথবা তার সমমূল্য।

☆ কখন আদায় করবেন সাদকাতুল ফিতর?

সাদকাতুল ফিতর আদায় করার দুটো সময় আছে। একটি হলো উত্তম সময়, অন্যটি বৈধ সময়। আদায় করার উত্তম সময় হলো ঈদের দিন ঈদের নামাযের পূর্বে।

যেমন হাদীসে এসেছে–

'ইবনে উমর থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে সাদকাতুল ফিতর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।' (মুসলিম শরীফ ১৬৩৬)

☆ সাদকাতুল ফিতর কাকে দেবেন?

যারা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত–এমন অভাবী লোকদেরকে সাদকাতুল ফিতর প্রদান করা যাবে। একজন দরিদ্র মানুষকে একাধিক ফিতরা দেওয়া যেমন জায়েয আছে, তেমনি একটি ফিতরা বণ্টন করে একাধিক মানুষকে দেওয়াও জায়েয।

ঈদের তাৎপর্য

হাদীস শরীফে আছে–

'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মদীনাতে আগমন করলেন তখন মদীনাবাসীদের দুটো দিবস ছিল, যে দিবসে তারা খেলাধুলা করত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, এ দুই দিনের কী তাৎপর্য আছে? মদীনাবাসীগণ উত্তর দিলেন : আমরা মূর্খতার যুগে এ দুই দিনে খেলাধুলা করতাম। তখন রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : 'আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ দুই দিনের পরিবর্তে তোমাদেরকে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দুটো দিন দিয়েছেন। তা হলো ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতর।' (আবু দাউদ ৯৫৯)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উম্মতে মুহাম্মদীকে সম্মানিত করে তাদের এ দুটো ঈদ দান করেছেন। আর এ দুটো দিন বিশ্বে যত উৎসবের দিন ও শ্রেষ্ঠ দিন রয়েছে, তার সব কটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন ও সেরা ঈদ।

ইসলামের এ দুটো উৎসবের দিন শুধু আনন্দ-ফুর্তির দিন নয়। বরং এ দিন দুটোকে খুশি-আনন্দের সাথে সাথে জগৎসমূহের প্রতিপালকের ইবাদত-বন্দেগী দ্বারা করবে সুসজ্জিত। যিনি জীবন দান করেছেন, দান করেছেন সুন্দর আকৃতি, সুস্থ শরীর, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন, যার জন্য জীবন ও মরণ তাকে এ আনন্দের দিনে ভুলে যাওয়া কিভাবে মেনে নেয়া যায়? তাই ইসলাম আনন্দ-উৎসবের এ দিনটাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত-বন্দেগী, তার প্রতি শুকরিয়া-কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দ্বারা সুসজ্জিত করেছে।

ঈদের দিনের করণীয়

☆ গোসল করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা। ঈদের দিন গোসল করার মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা মুস্তাহাব। কেননা এদিনে সকল মানুষ নামায আদায়ের জন্য মিলিত হয়। যে কারণে জুমু'আর দিন গোসল করা মুস্তাহাব সে কারণেই ঈদের দিন ঈদের নামাযের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব। হাদীসে এসেছে-

ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ঈদুল ফিতরের দিনে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করতেন। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব (রহ.) বলেন : ঈদুল ফিতরের সুন্নাত তিনটি : ঈদগাহে হেঁটে যাওয়া, ঈদগাহের দিকে রওনা হওয়ার পূর্বে মিষ্টিজাতীয় কিছু খাওয়া, গোসল করা। (মুআত্তা ইমাম মালেক)

এমনিভাবে সুগন্ধি ব্যবহার ও উত্তম পোশাক পরিধান করা মুস্তাহাব।

☆ ঈদের দিনে খাবার গ্রহণ

সুন্নাত হলো ঈদুল ফিতরের দিনে ঈদের নামায আদায়ের পূর্বে মিষ্টিজাতীয় খাবার গ্রহণ করা। আর ঈদুল আজহার দিন ঈদের নামাযের পূর্বে কিছু না খেয়ে নামায আদায়ের পর কুরবানীর গোশত খাওয়া সুন্নাত। হাদীস শরীফে এসেছে–

বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিতরের দিনে না খেয়ে বের হতেন না, আর ঈদুল আজহার দিনে ঈদের নামাযের পূর্বে খেতেন না। নামায থেকে ফিরে এসে কুরবানীর গোশত খেতেন। (মুসনাদে আহমদ ১৪২২)

☆ পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া

ঈদগাহে তাড়াতাড়ি যাওয়া উচিত। যাতে ইমাম সাহেবের নিকটবর্তী স্থানে বসা যায় ও ভালো কাজ অতি তাড়াতাড়ি করার সাওয়াব অর্জন করা যায়, সাথে সাথে নামাযের অপেক্ষায় থাকার সাওয়াব পাওয়া যায়। ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া মুস্তাহাব। হাদীসে এসেছে,

আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'সুন্নাত হলো ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া।' (তিরমিযী ১৮৭)

আর একটি সুন্নাত হলো : যে পথে

ঈদগাহে যাবে সে পথে না ফিরে অন্য পথে ফিরে আসা। যেমন হাদীসে এসেছে,

জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : 'নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদগাহে যে পথে যেতেন, ফিরতেন ভিন্ন পথে।' (বুখারী শরীফ ১৪৫)

☆ ঈদের তাকবীর আদায়

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিতরের দিন ঘর থেকে বের হয়ে ঈদগাহে পৌঁছা পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করতেন। ঈদের নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করতেন। যখন নামায শেষ হয়ে যেত তখন আর তাকবীর পাঠ করতেন না। আর কোনো কোনো বর্ণনায় ঈদুল আজহার ব্যাপারে একই কথা পাওয়া যায়। আরো প্রমাণিত আছে যে ইবনে উমর (রা.) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিনে ঈদগাহে আসা পর্যন্ত উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করতেন। ঈদগাহে এসে ইমামের আগমন পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করতেন।

ঈদের নামায

☆ ঈদের নামাযের হুকুম

'ঈদের নামায প্রত্যেক মুসলমান বালেগ পুরুষের ওপর ওয়াজিব।

☆ ঈদের নামাযের পূর্বে কোনো নামায নেই

হাদীসে এসেছে–

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, 'নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিতরের দিনে বের হয়ে দুই রাক'আত ঈদের নামায আদায় করেছেন। এর পূর্বে ও পরে অন্য কোনো নামায আদায় করেননি।' (বুখারী শরীফ ৯৩৫)

ঈদের নামায আদায়ের পদ্ধতি

ঈদের নামায হলো দুই রাক'আত। হাদীসে এসেছে–

উমর (রা.) বলেন : 'জুমু'আর নামায দুই রাক'আত, ঈদুল ফিতরের নামায দুই রাক'আত, ঈদুল আজহার নামায দুই রাক'আত ও সফর অবস্থায় নামায হলো দুই রাক'আত।' (নাসায়ী ১৪০৩)

ঈদের নামায শুরু হবে তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে।

ঈদের নামাযে অতিরিক্ত প্রত্যেক তাকবীরের পর হাত উঠাবে। প্রথম রাক'আতে তাকবীরসমূহ আদায় করার পর সূরা ফাতেহা পড়বে, তারপর যেকোনো সূরা পড়বে। দ্বিতীয় রাক'আতে কেরাআত শেষ হওয়ার পর অতিরিক্ত তাকবীর বলবে এবং রুকুতে যাবে। নামায শেষ হওয়ার পর ইমাম সাহেব খুতবা দেবেন। মনে রাখা দরকার, ঈদের খুতবা হবে নামায আদায়ের পর। নামায আদায়ের পূর্বে কোনো খুতবা নেই। হাদীসে এসেছে-

আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন ঈদগাহের উদ্দেশে রওনা হতেন। ঈদগাহে প্রথমে নামায শুরু করতেন। নামায শেষে মানুষের দিকে ফিরে খুতবা দিতেন, এ খুতবাতে তিনি তাদের ওয়াজ করতেন, উপদেশ দিতেন, বিভিন্ন নির্দেশ দিতেন। আর এ অবস্থায় মুসল্লীগণ তাদের কাতারে বসে থাকত।' (বুখারী শরীফ ৯৫৬)

☆ ঈদে শুভেচ্ছা বিনিময় করা

একে অপরকে শুভেচ্ছা জানানো, মানুষের সুন্দর চরিত্রের একটি দিক। এতে খারাপ কিছু নেই। বরং এর মাধ্যমে অপরের জন্য কল্যাণ কামনা ও দু'আ করা হয়। পরস্পরের মাঝে বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়। ঈদ উপলক্ষে পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানানো শরীয়ত অনুমোদিত একটি বিষয়। বিভিন্ন বাক্য দ্বারা এ শুভেচ্ছা বিনিময় করা যায়। যেমন :

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেছেন : 'জোবায়ের ইবনে নুফাইর থেকে বর্ণিত যে, রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবায়ে কেরাম ঈদের দিন সাক্ষাৎকালে একে অপরকে বলতেন :

تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ

'আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও আপনার ভালো কাজগুলো কবুল করুন।' (আল মু'জামুল কাবির লিত তাবারানী : ১৭৫৮৯)

☆ আত্মীয়স্বজনের খোঁজখবর নেওয়া ও তাদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া :

সদাচরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজনের মাঝে সবচেয়ে বেশি হকদার হলো মাতা-পিতা। তারপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য আত্মীয়স্বজন। আত্মীয়স্বজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও তাদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং সকল প্রকার মনোমালিন্য দূর করার জন্য ঈদ হলো একটা বিরাট সুযোগ। কেননা হিংসা-বিদ্বেষ ও আত্মীয়স্বজনের সাথে খারাপ সম্পর্ক এমন একটা বিষয়, যা আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। হাদীসে এসেছে–

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : 'সোম ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। যে আল্লাহর সাথে শিরক করে তাকে ব্যতীত সেদিন সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়; কিন্তু ওই দুই ভাইকে ক্ষমা করা হয় না, যাদের মাঝে হিংসা ও দ্বন্দ্ব রয়েছে।

তখন (ফেরেশতাদেরকে) বলা হয়, এ দুজনকে অবকাশ দাও যেন তারা নিজেদের দ্বন্দ্ব-বিবাদ মিটিয়ে মিলেমিশে যায়! এ দুজনকে অবকাশ দাও যেন তারা নিজেদের দ্বন্দ্ব-বিবাদ মিটিয়ে মিলেমিশে যায়! এ দুজনকে অবকাশ দাও যেন তারা নিজেদের দ্বন্দ্ব-বিবাদ মিটিয়ে মিলেমিশে যায়!!' (মুসলিম শরীফ ২৫৬৫)

এ সকল হাদীসে ভাই বলতে শুধু আপন ভাইকে বোঝানো হয়নি বরং সকল মুসলমানকেই বোঝানো হয়েছে। হোক সে ভাই অথবা প্রতিবেশী কিংবা চাচা বা বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী, সহপাঠী বা অন্য কোনো আত্মীয়। তাই যার সাথে ইতিপূর্বে ভালো সম্পর্ক ছিল, এমন কোনো মুসলমানের সাথে সম্পর্ক খারাপ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে মারাত্মক অন্যায়। যদি কেউ এমন অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে তার এ অন্যায় থেকে ফিরে আসার এক মহা সুযোগ হলো ঈদ।

ঈদে যা বর্জন করা উচিত :

ঈদ হলো মুসলমানদের শান-শওকত প্রদর্শন, তাদের আত্মার পরিশুদ্ধতা, তাদের ঐক্য-সংহতি ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উৎসব। কিন্তু দুঃখজনক হলো বহু মুসলিম এ দিনটাকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে জানে না। তারা এ দিনে বিভিন্ন অনৈসলামিক কাজকর্মে মশগুল হয়ে পড়ে। এ ধরনের কিছু কাজকর্মের আলোচনা করা হলো :

☆ কাফিরদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ বা আচরণ করা

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : 'যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্যতা রাখবে সে তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে।' (আবু দাউদ ৪০৩১)

☆ পুরুষ হয়ে নারীর-নারী হয়ে পুরুষের বেশ ধারণ

পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন ও সাজসজ্জার ক্ষেত্রে পুরুষের নারীর বেশ ধারণ ও নারীর পুরুষের বেশ ধারণ করা হারাম। ঈদের দিনে এ কাজটি অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। হাদীসে এসেছে–

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওই সকল মহিলাকে অভিসম্পাত করেছেন, যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং ওই সকল পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন, যারা মহিলার বেশ ধারণ করে। (আবু দাউদ ৪০৯৭)

☆ বেগানা মহিলা পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ

মনে রাখতে হবে যে, মহিলাদের জন্য খোলামেলা ও অশালীন পোশাকে রাস্তাঘাটে বের হওয়া ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

'আর তোমরা নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন মূর্খতার যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না।' (আহযাব ৩৩)

হাদীসে এসেছে–

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : 'দুই ধরণের জাহান্নামী আছে, যাদের আমি এখনো দেখতে পাইনি। (আমার যুগের পরে দেখা যাবে) একদল লোক যাদের সাথে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা লোকজনকে প্রহার করবে। আর একদল এমন মেয়ে লোক, যারা পোশাক পরিধান করেও উলঙ্গ হবে। অন্যদের আকৃষ্ট করবে ও তারা অন্যদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায়। ওরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি তার সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি বহু দূর থেকে পাওয়া যাবে।' (মুসলিম : ২১২৮)

☆ বেগানা মহিলাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ

অনেককে দেখা যায় অন্যান্য সময়ের চেয়ে এই গোনাহের কাজটা ঈদের দিনে বেশি করে। নিকটাত্মীয়দের মাঝে যাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ শরীয়ত অনুমোদিত নয়, তাদের সাথে অবাধে দেখা-সাক্ষাৎ করা হয়। হাদীসে এসেছে–

সাহাবী উকবাহ ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : 'তোমরা বেগানা মেয়েদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবে।' আনসারী সাহাবীদের মধ্য থেকে এক লোক প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! দেবর-ভাশুর প্রমুখ আত্মীয়দের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তিনি উত্তরে বললেন : ' এরা তো মৃত্যুর সমতুল্য।' (মুসলিম শরীফ ২১৭২)

এ হাদীসে আরবী حمو শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এমন সকল আত্মীয়, যারা স্বামীর সম্পর্কের দিক দিয়ে নিকটতম। যেমন স্বামীর ভাই, তার মামা, খালু প্রমুখ। তাদেরকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করার কারণ হলো, এ সকল আত্মীয়স্বজনের মাধ্যমেই বেপর্দাজনিত কেলেঙ্কারি বেশি ঘটে থাকে।

ইসলামী অর্থনীতি

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১৮

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

মুদ্রার মান : (Value)

প্রাচীনকালে মুদ্রার সম্পর্ক ছিল স্বর্ণ-রৌপ্যের বিশেষ এক মানদণ্ডের সাথে। যখনই স্বর্ণ-রৌপ্যের উক্ত মানদণ্ড ঊর্ধগামী হতো তখন মুদ্রার মূল্যও বৃদ্ধি পেত। পক্ষান্তরে যখন স্বর্ণ-রৌপ্যের উক্ত মানদণ্ডের নিম্নগতি হতো তখন মুদ্রার মূল্যও কমে যেত। কিন্তু বর্তমানে যেহেতু স্বর্ণ-রৌপ্যের সাথে মুদ্রার কোনো প্রকারের সম্পর্ক নেই তাই মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া ও কমে যাওয়ার সাথে স্বর্ণ-রৌপ্যের কোনো প্রকারের সম্পর্ক বহাল নেই। বরং উক্ত উত্থান-পতনের বর্তমান মানদণ্ড হলো পণ্যসামগ্রীর মূল্য (Goods commodities) তাই বর্তমান সময়ে মুদ্রার মূল্য বলতে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতাকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ ওই শক্তি ও ক্ষমতা যার ভিত্তিতে মুদ্রা নিজের বিনিময়ে অন্য কোনো পণ্য বা সেবা অর্জনে সক্ষম হয়।

মুদ্রার মধ্যে স্বকীয় দৃষ্টিতে তেমন গুরুত্বের কিছু নেই, তবে এর সাহায্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবাসমূহ অর্জন করা যায় বিধায় মুদ্রার গুরুত্ব।

যদি মুদ্রা নির্দিষ্ট পরিমাণের বিনিময়ে অধিক পণ্য ও সেবা অর্জনে সক্ষম হয় তাহলে মুদ্রার ভ্যালু বাড়বে, যদি উক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণের বিনিময়ে ওই পরিমাণ পণ্য ও সেবা অর্জনে সক্ষম না হয় তাহলে মুদ্রার ভ্যালু কমে যাবে। যথা ২০০১ সালে ৩০ টাকা দিয়ে তিন কেজি আটা পাওয়া যেত। ২০০২ সালে উক্ত ৩০ টাকা দিয়ে দুই কেজি আটা পাওয়া গেল। এখানে প্রথমোক্ত উদাহরণে মুদ্রার মূল্য পরবর্তী উদাহরণের তুলনায় বেশি এবং দ্বিতীয় উদাহরণে মুদ্রার মূল্য প্রথম উদাহরণের তুলনায় কম।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা গেল, মুদ্রার মূল্য ও পণ্য, সেবা ইত্যাদির মূল্যের মধ্যে বৈপরীত্যমূলক সম্পর্ক বিরাজমান। যখন পণ্য ও সেবা ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধি পায় তখন মুদ্রার মূল্য কমে যায় পক্ষান্তরে যখন পণ্য ও সেবা সামগ্রীর মূল্য কমে যায় তখন মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পায়।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা আরো স্পষ্ট করে দিল যে, মুদ্রা যখন থেকে স্বর্ণ-রৌপ্যের আত্ততামুক্ত হয়ে গেছে তখন থেকে মুদ্রার মূল্য (Value) পণ্যও সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে গেছে। তাই সারকথা হিসেবে আমরা বলতে পারি যে, মুদ্রার ভ্যালুর অর্থ হলো, মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা যাকে আরবীতে القوة الشرائية এবং ইংরেজিতে Purchasing power বলা হয়। তথ্য সূত্র احكام الاوراق النقدية ২৭، كاغذى نوٹ اور كرنسى كا حكم ৪৫، كتاب معاشيات ২/৪৭ ইত্যাদি।

মুদ্রার মূল্যে (Value) পরিবর্তন :

মুদ্রার মূল্যে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন সংঘটিত হতে থাকে। যা নতুন কোনো বিষয় নয়। যার উপস্থিতি প্রাচীনকাল থেকে। বিষয়টি সাহাবায়ে কেরামের উক্তি এবং ফিক্বহ বিশারদদের আলোচনায় সবিস্তারে উঠে এসেছে ফিক্বহের কিতাবসমূহে।

বর্তমান যুগে যেহেতু মুদ্রার মূল্য value পরিবর্তনকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং অনেক শরীয়া হুকুম ও বিধানের সম্পর্ক এর সাথে জড়িত তাই মুদ্রার মূল্য পরিবর্তনের বিষয়টা সামান্য ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

মুদ্রার মধ্যে মূলত চার প্রকারের পরিবর্তন পাওয়া যায়।

১. انقطاع (Forfeture) মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হয়ে যাওয়া। ২. كساد Depression বা ব্যবহার ছেড়ে দেওয়া, চাহিদা হ্রাস পাওয়া। ৩. افراط زر (Inflation) অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি। ৪. تفريط زر (Deflation) অস্বাভাবিক মূল্য হ্রাস।

অর্থাৎ- মুদ্রার মধ্যে অনেক সময় এমন পরিবর্তনও এসে যায় যে, যদি উক্ত মুদ্রা প্রথাগত ছমন হয় তাহলে তার ছমন হওয়ার যোগ্যতাই একেবারে শেষ হয়ে যায়। যদি প্রকৃতিগত ছমন হয় তাহলে তার ছমন হওয়ার যোগ্যতা তো আর শেষ হয়ে যায় না তবে এর লেনদেন ও প্রচলন বন্ধ হয়ে যায়। আবার কখনো এমন পরিবর্তন মুদ্রার মধ্যে এসে যায় যার ফলে হয়তো মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পায় অথবা হ্রাস পায়।

উপর্যুক্ত পরিবর্তনের প্রকারসমূহের ব্যাখ্যা :

১. انقطاع (Forfeture) অর্থাৎ, সাধারণত শহরে/বাজারে কোনো মুদ্রার অনুপস্থিতি যদিও মানি চেঞ্জারে (Money changer) বা কারো ঘরে পাওয়া যায়।

আল্লামা শামী (রহ.) উক্ত প্রকারের ব্যাখ্যায় লেখেন–

ان لا يوجد النقد فى السوق وان وجد فى يد الصارفة والبيوت الخ (رد المحتار ৭/৪১)

অর্থাৎ, মুদ্রা বাজারে পাওয়া না যাওয়া,

যদিও মানি চেঞ্জার এবং ঘরে পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে আল্লামা যরকানী ও আল্লামা বেনানী (রহ.) লেখেন–

انه الانعدام جملة فى بلد تعامل المتعاقدين وان وجدت الفلوس حين القبض فى غيرها (شرح الزرقانى على خليل بحاشية البنانى ٥/٦٠)

অর্থাৎ انقطاع (Forfeture) বলা হয়, একই সময়ে উভয় আকদকারীর শহর থেকে মুদ্রা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া যদিও কবজ করার সময় পয়সা অন্য কোনো শহরে পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, মুদ্রার উপরোক্ত পরিবর্তন বোঝানোর জন্য انقطاع শব্দ ছাড়াও ফুকাহায়ে কেরামে অনেক শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা তাদের বক্তব্যে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এ বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরামের মাযহাবসমূহ :

انقطاع বিষয়ে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর একটা মত এটাও পাওয়া যায় যে, এমতাবস্থায় বাঈ (ক্রয়-বিক্রয়) ফাসিদ হয়ে যাবে। তবে অপর মত যা গ্রহণযোগ্য এবং সাহেবাঈন ও ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলসহ সবারই মত, সেই অনুসারে انقطاع এর ফলে বাঈ ফাসিদ হয় না। যথা আল্লামা শামী (রহ.) লেখেন–

ان انقطعت بان لا توجد فى السوق ولو وجدت فى يد الصارفة او فى البيوت فقيل يفسد البيع وقيل تجب فى آخر يوم الانقطاع وهو المختار (العقود الدرية فى تنقيح الفتاوى الحامدية ١/٢٨٠).

অর্থাৎ, যদি মুদ্রার প্রচলন একেবারেই বন্ধ হয়ে যায় এমনকি বাজারে পাওয়াও যায় না। যদিও মানি চেঞ্জারে ও ঘরে পাওয়া যায় তাহলে এমতাবস্থায় কোনো কোনো মতানুসারে বাঈ ফাসিদ হয়ে যাবে অপর মত অনুসারে যেই দিন প্রচলন বন্ধ হয়ে ছিল ওই দিন উক্ত মুদ্রার যেই মূল্য ছিল, ওই মূল্য আদায় ওয়াজিব হবে। এই মতটাই পছন্দনীয়।

আল্লামা শামী (রহ.) আরো লেখেন–

فان انقطع ذلك فعليه من الذهب والفضة قيمته فى آخر يوم انقطع وهو المختار (رد المحتار ٧/٤١)

অর্থাৎ, যদি মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এর দায়িত্বে স্বর্ণ অথবা রৌপ্যের মূল্য আদায় করা ওয়াজিব হবে, যাতে ওই দিনের হিসাব করা হবে, যেই দিন উক্ত মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হয়েছিল। এটাই প্রাধান্য প্রাপ্ত মত।

আল্লামা শামী (রহ.) অন্য এক পুস্তিকায় লেখেন–

وان انقطع بحيث لا يقد ر عليها فعليه قيمتها فى آخر يوم انقطع من الذهب والفضة هو المختار (تنبيه الرقود على مسائل النقود ضمن رسائل ابن عابدين ٢/٥٨)

অর্থাৎ যদি মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হয়ে যায় এমনকি সে আদায় করতে অপরাগ তাহলে উক্ত আকদকারীর ওপর মুদ্রার মূল্য স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা আদায় করা ওয়াজিব হবে। যাতে প্রচলন বন্ধ হয়ে যাওয়ার দিনের হিসাব করা হবে এবং এটাই প্রাধান্য প্রাপ্ত মত।

উক্ত পুস্তিকায় আল্লামা শামী (রহ.) অন্যত্র আরো লেখেন যে,

وان انقطعت تلك الدراهم اليوم كان عليه قيمة الدراهم قبل الانقطاع عند محمدؒ وعليه الفتوى (تنبيه الرقود على مسائل النقود ٢/٥٧، ٦٠).

অর্থাৎ, যদি উক্ত দিরহামগুলোর প্রচলন আজকেই বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এর দায়িত্বে প্রচলন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পূর্বে দিরহামের যেই মূল্য ছিল তা ওয়াজিব হবে। এই মতটা ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর এবং এই মতের ওপরই ফাতাওয়া।

ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতে মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হয়ে গেলে এর মূল্য ওয়াজিব হয় এবং আকদে ফাসিদ না হয়ে বহাল থাকে। এতটুকুর ওপর উল্লিখিত ইমামগণের ঐকমত্য রয়েছে। তবে ভিন্নতা হলো কোন সময়ের মূল্য ধর্তব্য হবে, তা নিয়ে।

মালেকী মাযহাবের বিশুদ্ধ মতানুসারে সিদ্ধান্তের সময় বন্ধ হয়ে যাওয়া মুদ্রার যেই মূল্য হবে, তা আদায় করা ওয়াজিব হবে।

শাফেঈ মাযহাব মতে, যেই সময় বিক্রেতা ক্রেতার নিকট বিক্রিত পণ্যের ছমন দাবি করবে ওই সময় বন্ধ হয়ে যাওয়া মুদ্রার যা মূল্য হবে, তাই ধর্তব্য হবে। যদি উক্ত ক্রয়-বিক্রয় বাঈ মুয়াজ্জল পদ্ধতিতে হয় তাহলে যখন মূল্য পরিশোধের সময় আসবে তখন মুদ্রার যা মূল্য হবে তা-ই ধর্তব্য হবে। হাম্বলী মাযহাব, ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে প্রচলন বন্ধ হওয়ার দিন ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ, যেই দিন মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এর আগের দিন মুদ্রার যেই মূল্য ছিল তা-ই ধর্তব্য হবে। তবে হাম্বলীদের মতে যদি তা অনুরূপীয় হয় এবং তা সচরাচর পাওয়া যায় ওই রকম হয় তাহলে তার অনুরূপ যা তা আদায় করা ওয়াজিব হবে।

উপরোক্ত ইমামগণের মতামতের সারমর্ম :

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে উক্ত বাঈ (ক্রয়-বিক্রয়) বাতিল হবে।

মালেকী মাযহাব মতে, সিদ্ধান্তের সময়ের মূল্য ওয়াজিব হবে।

শাফেঈ মাযহাব মতে, মূল্য দাবি করার সময়ের মূল্য ওয়াজিব হবে।

হাম্বলী মাযহাব ও ইমাম মুহাম্মদের মতে, প্রচলন বন্ধ হয়ে যাওয়ার দিনের মূল্য ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে, আকদ করা বা লেনদেনের সময়ের মূল্য ধর্তব্য হবে।

আল্লামা শামী (রহ.) লেখেন–

واما الكساد والانقطاع فالذى يظهر ان البيع لا يفسد اجماعا اذا سميا نوعا منه وذلك لانهم ذكروا فى الدراهم التى غلب غشها ثلاثة اقوال الاول قول ابى حنيفة بالبطلان والثانى قول الصاحبين بعدمه وهو قول الشافعى واحمد لكن قال ابو يوسف عليه قيمتها وقت البيع وقال محمد يوم الانقطاع ، وفى الذخيرة الفتوى على قول ابى يوسف وفى التتمة والمحتار والحقائق بقول محمد يفتى رفقا بالناس (تنبيه الرقود على مسائل النقود ٢/٦٢)

মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং চাহিদা হ্রাস পাওয়ার মধ্যে বাহ্যত সর্বসম্মতভাবে বাঈ ফাসিদ হয় না, যখন ক্রেতা-বিক্রেতা মুদ্রার বিশেষ একটা প্রকার উল্লেখ করে থাকে। তার কারণ হলো যেসব দিরহামে খাদ/অন্য ধাতুর পরিমাণ বেশি ওই সব দিরহাম বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরাম তিনটা মত পেশ করেছেন।

প্রথমত : বাঈ বাতিল হয়ে যাবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মত।

দ্বিতীয়ত : সাহেবাঈনের মত। তাহলো আকদ বাতিল হবে না। এই মতটা ইমাম শাফেঈ এবং ইমাম আহমদ (রহ.)-এরও। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, ক্রেতার ওপর আকদের দিনের মূল্য ওয়াজিব হবে এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, উক্ত মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হয়ে যাওয়ার দিনের মূল্য ওয়াজিব হবে যাখিরা গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতের ওপরই ফাতাওয়া। তবে তাতিম্মাহ, মুহতার এবং হাকায়েকের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, সর্বসাধারণের সুবিধার্থে ফাতাওয়া ইমাম মুহাম্মদের মতের ওপর।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতের যুক্তি। তাঁর মতে, মুদ্রা যখন শেষই হয়ে গেছে ফলে ছমনও শেষ হয়ে গেছে। বাঈ ছমন ছাড়া হয় না তাই বাঈ বাতিল হয়ে যাবে।

সাহেবাঈনের মতের দলিল। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) লেনদেনের সময় ও আকদের সময়ের হিসাব এ জন্য করেন যে, ক্রেতার জিম্মায় যেই ছমন ওয়াজিব হয়েছে, তা আকদের কারণেই হয়েছে। সুতরাং মূল্যের মধ্যেও ওই সময়ের হিসাব করা হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, যেদিন মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হয়ে যাবে, ওই দিনের মূল্যই ধর্তব্য হবে। কেননা প্রচলন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পূর্বে ক্রেতা ছমন আদায়ে সক্ষম ছিল। ছমন আদায়ে অপরাগতা প্রচলন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে। তাই মূল্যের মধ্যে অপারগতার সময়েরই হিসাব করতে হবে।

(مجلة مجمع الفقه الاسلامى جده الدورة الخامسه العدد الخامس الجزء الثالث ١٤٠٩ ص ١٦٥٤)

মালেকী মাযহাব : তাদের নিকট নির্ভরযোগ্য এবং বিশুদ্ধ মতানুসারে উপরোক্ত অবস্থায় সিদ্ধান্তের সময়ের মূল্যই ধর্তব্য হবে। তাদের দ্বিতীয় মত হলো, যেদিন মূল্য পরিশোধের পূর্বনির্ধারিত তারিখ হবে এবং যেদিন মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হয়ে যাবে, উভয়টার মধ্যে যেটা পরে হবে ওই দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। যথা–মূল্য পরিশোধের দিন বিশ দিন পরে এবং মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হয়ে যাওয়া আঠার দিন পর তাহলে এ ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধের দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। মালেকী মাযহাবের বক্তব্য নিম্নে পেশ করা হলো–

فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ان عدمت الفلوس بالكلية فى بلد المتعاقدين وان وجدت فى غير ها فالقيمة واجبة على من ترتبت عليه مما تجدد اى يدفعها مما تجدد وظهر من المعاملة فيقال : ما قيمة العشرة من الدراهم التى عدمت بهذه الدراهم التى تجددت فيقال ثمانية دراهم مثلا فيدفع المدين ثمانية من تلك الدراهم التى تجددت واذا قيل قيمتها اثنا عشر دفع اثنى عشر منها وهكذا۔

وقال خليل : تعتبر القيمة وقت اجتماع الاستحقاق اى الحلول ويوم العدم ، فالعبرة عنده بالمتأخر منهما فان كان العدم والاستحقاق حصلا فى وقت واحد فالامر ظاهر وان تقدم احدهما على الآخر فالعبرة بالمتأخر منهما اذ لا يجتمعان الا فى وقت المتأخر منهما، فان استحقت ثم عدمت اعتبرت القيمة يوم الاستحقاق ولم يذكر الخليل القول المعتمد

وقال الدردير : المعتمد ان القيمة تعتبر يوم الحكم

وقال الخرشى ان عدمت فالواجب على من ترتبت عليه قيمتها مما تجدد وظهر، وتعتبر قيمتها وقت ابعد الاجلين عند تخالف الوقتين من العدم والاستحقاق۔۔۔ وفى شرح الزرقانى وهذا كله على مختار المصنف خليل هنا تبعا لابن الحاجب تبعا للخمى وابن محرر والذى اختاره ابن يونس وابو حفص، ان القيمة تعتبر يوم الحكم، قال ابو الحسن الشاذلى وهو الصواب وقال البرزلى وهو ظاهر المدونة (حاشية الدسوقى ٣/٤٥، ٤٦، الخرشى على الخليل ٥/٥٥، شرح الزرقانى ٥/٦٠)

উপর্যুক্ত বক্তব্যসমূহের সারকথা হলো, মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হয়ে গেলে তখন

মালেকী মাযহাবের দুটো মত। প্রথমত : বিক্রেতা তার পাওনার উপযোগী/অধিকারী হওয়ার দিন এবং প্রচলন বন্ধ হয়ে যাওয়ার দিনের মধ্যে যেই দিনটা দূরবর্তী হবে, ওই দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। দ্বিতীয়ত : সিদ্ধান্তের দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। এই মতটাই যথার্থ এবং প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। যেমনটা শরহে যরকানীর উল্লিখিত বক্তব্য থেকে স্পষ্টত বোঝা যায়।

শাফেঈ মাযহাব :

তাদের মতে, মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হয়ে গেলে তখন আকদের দিন বা লেনদেনের দিনের মূল্য ওয়াজিব হবে। তবে এই হুকুমটা হলো ওই সময়, যদি মুদ্রা অনুরূপীয় না হয়। কারণ মুদ্রা যদি অনুরূপীয় হয় তাহলে তার অনুরূপ আদায় করা ওয়াজিব হবে।

আল্লামা রমলী (রহ.) লেখেন–

فان فقد وله مثل وجب والا قيمته وقت المطالبة (نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ٣/٣٩٩)

অর্থাৎ, যদি মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হয়ে যায় এবং এর অনুরূপ মুদ্রা পাওয়া যায় তাহলে অনুরূপ মুদ্রা আদায় করা ওয়াজিব হবে। অন্যথায় মুদ্রার আবেদনের সময় যেই মূল্য দাঁড়াবে তা আদায় করা ওয়াজিব হবে।

আল্লামা ইবনে হাজর হাইতমী (রহ.) লেখেন–

ويرد وجوبها حيث الاستبدال المثل فى المثلى ولو نقد ا ابطله السلطان لانه اقرب الى حقه (تحفة المحتاج مع حاشية الشروانى ٥/٤٤)

অর্থাৎ, অনুরূপীয় এর মধ্যে অনুরূপ আদায় করা অত্যাবশ্যকীয় যদিও বাদশাহ মুদ্রা বাতিল করে দেন। কেননা এটাই পাওনাদারের প্রাপ্যের অতীব নিকটে।

আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) লেখেন–

ان عدمت الفلوس العتق فلم توجد اصلا رجع الى قدرقيمتها من الذهب والفضة ويعتبر ذلك يوم المطالبة (الحاوى للفتاوى)

অর্থাৎ, যদি প্রাচীনকালের পয়সা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং মোটেই পাওয়া যায় না তাহলে এমতাবস্থায় স্বর্ণ-রৌপ্যের মূল্য ওয়াজিব হবে এবং মূল্যে আবেদনের দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে।

হাম্বলী মাযহাব :

তাদের মতামত হলো ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মত। অর্থাৎ প্রচলন বন্ধ হয়ে যাওয়ার দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে।

যেমনটা আল্লামা বহুতী (রহ.) লেখেন–

فان اعوز المثل قال فى الحاشية عوز الشئ عوزا من تعب عز فلم يوجد واعوزنى المطلوب مثل اعجزنى لفظا ومعنى لزم المقترض قيمته اى المثل يوم اعوازه لانها حينئذ ثبتت فى الذمة ويجب على المقترض رد قيمة ماسوى ذلك اى المكيل والموزون لانه لا مثل له فضمن بقيمته كالغصب (كشف القناع عن متن الاقناع ٣/٣٠٢)

অর্থাৎ, যদি অনুরূপ আদায় করতে অপারগ হয়ে যায় তাহলে ঋণগ্রহীতার ওপর অনুরূপের মূল্য ওয়াজিব হবে। এতে অপারগতার দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। কেননা এটাই তার দায়িত্বে ওয়াজিব হয়েছে। যদি অনুরূপীয় না হয় তাহলে মূল্য ওয়াজিব হবে।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ-মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে।

তারাবীতে কোরআন খতমের বিনিময়

মুফতী শরীফুল আজম

মাহে রমাজান প্রতিবছর ঘুরে ঘুরে মু'মিন-মুসলমানের কাছে আগমন করে, রহমত, মাগফিরাত আর মুক্তির বার্তা নিয়ে। এই একটি মাসের অপেক্ষায় চাতকের ন্যায় তাকিয়ে থাকেন আল্লাহর নৈকট্যকামী বান্দাগণ। অসংখ্য অগণিত নেকী কামাইয়ের এমন সুবর্ণ সুযোগ অন্য মাসে পাওয়া যায় না। তাই রমাজানের রাত-দিন মাসব্যাপী চলে সিয়াম-কিয়ামের মহাসাধনা।

তারাবীর নামাযে পবিত্র কোরআন খতম করা, নিজে পড়া বা শোনা এক বিশাল সৌভাগ্যের বিষয়। পবিত্র কোরআন নামাযে দাঁড়িয়ে তেলাওয়াত করলে প্রতিটি হরফে একশত নেকী। বসে তেলাওয়াত করলে পঞ্চাশ নেকী। নামাযের বাইরে অজুর সাথে তেলাওয়াত করলে পঁচিশ নেকী আর অজু ছাড়া প্রতিটি হরফে দশ নেকী পাওয়া যায়। উপরন্তু রমাজান মাস হলে সত্তর গুণ সাওয়াব বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। এ ছাড়া এ মাসে রয়েছে শবেকদরের মতো মূল্যবান একটি রজনী। এক হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম ওই রাতের ইবাদত। ওই রাতের তারাবীতে যে তেলাওয়াত হবে এর সাওয়াব এক হাজার মাসের তেলাওয়াত অপেক্ষা অধিক।

একজন হাফেজে কোরআনের পক্ষেই কেবল সম্ভব নামাযের মাঝে পূর্ণ কোরআন খতমের সাওয়াব অর্জন। যারা হাফেজ নয়, তাদের পক্ষে ওই সাওয়াব অর্জন সম্ভব না হলেও হাফেজের পেছনে দাঁড়িয়ে শ্রবনের সাওয়াব তারা অর্জন করতে পারে। এভাবে মাহে রমাজানে সিয়াম-কিয়ামের সাধনায় সকলে যুক্ত থাকতে পারে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্ত্ব যে, কিছু পার্থিব স্বার্থ এসে বাদ সাধে মাহে মোবারকের এই সাধনা-আরাধনার মাঝে। একদল সরলমনা, দ্বীন-দরদি ভাই হাফেজ সাহেবদের প্রতি দয়াবান হয়ে তাদের জন্য সব উজার করে দিতে উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। অপরদিকে একদল হাফেজ ভালো মসজিদ আর বড়লোকের মসজিদে হুমড়ি খেয়ে পড়েন। ইন্টারভিউ দেন আর নানা তদবীরের আশ্রয় নেন। এমন অসুস্থ প্রতিযোগিতার ফলে মাহে রমাজানের শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে কি না; তারাবীর হাফেজদের কেন্দ্র করে লেনদেনের ফলে কোরআনের মতো নেয়ামতের নাশোকরী হচ্ছে কি না, একটু ভেবে দেখা দরকার।

যে হাফেজ সাহেবের উসিলায় সাধারণ মুসল্লিগণ অসংখ্য অগণিত নেকী কামাই করতে সক্ষম হলেন তাঁর কাছে চির ঋণী থাকাটাই স্বাভাবিক। সরলমনা মুসল্লিগণ মনে করেন, হাফেজ সাহেব একটি মাস আমাদের জন্য কষ্ট করলেন এখন যদি আমরা তাঁর জন্য কিছুই না করি। তাহলে আমাদের ওপর হাফেজ সাহেবের দাবি থেকে যাবে। আমরা তাঁর কাছে ঋণী থেকে যাব। তাই এই ঋণ শোধ করতে চাঁদা তুলে হাদিয়ার ব্যবস্থা করে থাকে। কিন্তু সরলতার কারণে হয়তো তারা এ কথা ভাবে না যে, কিসের ঋণ কী দিয়ে শোধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। অসংখ্য নেকীর ঋণ কয়েক হাজার টাকা দিয়ে শোধের চেষ্টা কি অবমাননার শামিল নয়? একটি মাত্র নেকীর জন্য অনেকের জান্নাতে প্রবেশ স্থগিত হয়ে থাকবে। দ্বারে দ্বারে জনে জনে ধরনা দিয়েও সেদিন একটি মাত্র নেকী জোগাড় করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। তাহলে হাফেজ সাহেবের ঋণ শোধের দুঃসাহসিকতা কেন? সব ঋণ কি পরিশোধ করা যায়? মায়ের দুধের ঋণ, শিক্ষকের ঋণ, অথবা মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের ঋণ কি কেহ শোধ করতে পারবে? বস্তুত এসব ঋণ শুধু স্বীকার করে কৃতজ্ঞ হতে হয়, কখনো শোধ করা যায় না। তারাবীর হাফেজদের ঋণও এর চেয়ে চড়া মূল্য রাখে, দুনিয়াতে যার কোনো তুলনাই হতে পারে না। এ ঋণ আজীবন স্বীকার করে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। শোধ করা যাবে না। তাঁদের জন্য দু'আ করতে হবে 'জাযাকাল্লাহু খাইরান'। আর বাস্তবেও আল্লাহ তা'আলার পক্ষেই কেবল সম্ভব তাদের যথাযথ প্রতিদান দেওয়া।

হাফেজ সাহেবদের কষ্টের বিনিময়ে কিছু দেওয়ার মানসিকতা তাদের প্রতি চরম অবজ্ঞা এবং ধৃষ্টতার শামিল। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি সহজে বুঝে আসতে পারে। ধরুন, একজন কৃষক দু-মুঠো অন্ন জোগাড়ের জন্য জমিতে হাঁড়ভাঙা মেহনত করে আর এই মেহনতকেই সে একমাত্র চলার মাধ্যম মনে করে। অপরদিকে কৃষিমন্ত্রী এসি রুমে বসে বসে সরকারি দায়িত্ব পালন করেন, কায়িক পরিশ্রম কাকে বলে তার সংজ্ঞাও হয়তো তিনি জানেন না। এখন যদি ওই কৃষক মনে করে মন্ত্রী মহোদয় বেচারা কোনো কাজকাম করেন না, হাল জোত বায় না, তিনি খাবেন কী করে? তাঁর জন্য আমাদের কিছু করা উচিত। তাঁর কষ্টের বিনিময় না দেওয়াটা হবে চরম অমানবিক। কৃষকের এমন ভাবনাকে কিভাবে মূল্যায়ন করা হবে? এটা কি মন্ত্রীর প্রতি দয়ার প্রকাশ নাকি মন্ত্রীর শানে বেয়াদবী?

সরকারের সামান্য সুযোগ-সুবিধাভোগী মন্ত্রীর ব্যাপারে যদি এমন ভাবনা গ্রহণযোগ্য না হয় তবে একজন হাফেজে কোরআনের ব্যাপারে তা গ্রহণযোগ্য হবে কী করে? কোরআনের হাফেজের সম্পর্ক

তো দুনিয়ার অস্থায়ী সরকার বা রাজা-বাদশাহর সাথে নয়, বরং তার সম্পর্ক সকল রাজাধিরাজের সাথে। কোরআন যার কালাম সেই মহান রাব্বুল আলামীনের সাথে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

عن انسؓ قال قال رسول الله ﷺ ان لله اهلين من الناس قالوا من هم يارسول الله ﷺ قال اهل القرآن هم اهل الله وخاصته (ابن ماجه)

অর্থ : হযরত আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহর খাছ পরিবারস্থ লোক। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? হুজুর (সা.) বলেন, কোরআন ওয়ালারাই আল্লাহর পরিবারভুক্ত খাছ লোক। (ইবনে মাজাহ)

অতএব হাফেজে কোরআন, যিনি ত্রিশ পারা কোরআন বক্ষে ধারণ করে সদাসর্বদা তার চর্চায় লিপ্ত থাকেন, নিঃসন্দেহে সে আল্লাহর আহাল তথা-খাছ বান্দা। দুনিয়ার সর্বোচ্চ পদের অধিকারীর চেয়েও যে তার মূল্য বেশি, এটা বলাই বাহুল্য। তাই হাফেজ সাহেব চলবেন কিভাবে? খাবেন কী? এমন ভাবনা তাঁর প্রতি অবজ্ঞা ও দৃষ্টতার অন্তর্ভুক্ত। আবার সামান্য কিছু টাকা দিয়ে অনেক হয়েছে মনে করা আরো মারাত্মক বেয়াদবী। যে কোরআনের উসিলায় সারা দুনিয়ার মাখলুক খাচ্ছে, সেই কোরআন কি স্বয়ং কোরআনের ধারক-বাহককে খাওয়াবে না!

অপরদিকে কিছু আত্মভোলা হাফেজ নিজের মূল্য বুঝতে না পেরে বিভিন্ন হিলা-বাহানার আশ্রয়ে খতম তারাবীর পারিশ্রমিক গ্রহণ করে চলছে। শরীয়তে যার কোনো অনুমতি নেই। এতে করে তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হচ্ছে। উচিত তো ছিল পার্থিব স্বার্থ ত্যাগ করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে প্রতিদান প্রত্যাশা করা এবং তাতেই তুষ্ট থাকা। সরকারের মন্ত্রীদের সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। জনগণের সেবা করে জনগণের কাছ থেকে কিছু নিলে তা উৎকোচ হিসেবে গণ্য হয়। তদ্রূপ হাফেজ সাহেবও মুসল্লিদের যে অতিরিক্ত সাওয়াবের ব্যবস্থা করে দিলেন এর বিনিময়ে মুসল্লিদের কাছ থেকে কিছু নিতে পারেন না। তারাবীর নামায তো ছোট ছোট সূরা দিয়ে পড়ে নিলেও আদায় হয়ে যায়। গুনাহ হয় না। কোরআন খতমে শুধু অতিরিক্ত সাওয়াব মেলে, যা সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক বিষয়। এমন ঐচ্ছিক ইবাদতের পারিশ্রমিক আদান-প্রদান শরীয়তে বৈধ নয়।

তারাবীর মাঝে তিনটি বিধান :

আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়টি বোঝার সুবিধার্থে এ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, তারাবীর মাঝে তিনটি দিক রয়েছে এবং প্রতিটির হুকুমও ভিন্নতর। এখানে শুধু একটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে। এতে বাকি দুটি বিষয়কে টেনে আনার অবকাশ থাকবে না। ওই তিনটি বিধান হচ্ছে–

১. তারাবীর নামাযের হুকুম।
২. জামা'আতের সাথে আদায়ের হুকুম।
৩. তারাবীতে পূর্ণ কোরআন খতমের হুকুম।

তারাবীর নামায :

রমাজানের প্রতি রাতে বিশ রাক'আত তারাবীর নামায আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। এতে ন্যূনতম তিন আয়াত বা ছোট ছোট সূরা দিয়ে পড়ে নিলেই ওই সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

এ ক্ষেত্রে ফকীহদের উক্তি নিম্নরূপ :

التراويح سنة مؤكدة لمواظبة الخلفاء الراشدين للرجال والنساء اجماعا (الدر المختار مع الرد ٢/٤٣)

খোলাফায়ে রাশেদীনের পাবন্দীর সাথে আদায়ের ভিত্তিতে এ বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, তারাবীর নামায নারী-পুরুষ সকলের জন্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। (আদ্দুররুল মুখতার)

لوقرأ ثلاثا فصاعدا او آية طويلة فى الفرض فقد احسن ولم يسئ فما ظنك بالتراويح-

যদি কেউ ফরয নামাযে ছোট তিন আয়াত বা বড় এক আয়াত তেলাওয়াত করে তার নামায হয়ে যায়, কোনো রূপ গুনাহ হয় না। তাহলে তারাবীও এভাবে হয়ে যাবে, যা বলার অবকাশ রাখে না।

افتى ابو الفضل الكرمانى انه اذا قرأ فى التراويح الفاتحة وآية او آيتين لا يكره

আবুল ফযল কীরমানীর (রহ.) ফাতাওয়া মতে, তারাবীতে সূরা ফাতেহা এবং ১-২ আয়াত তেলাওয়াত করা হলে তা মাকরূহ হবে না। (আদ্দুররুল মুখতার)

তারাবীর জামা'আত :

তারাবীর নামায মসজিদে জামা'আতের সাথে আদায় করা সুন্নাতে কেফায়া। মূলত নামাযটি হচ্ছে সুন্নাতে আইন নারী-পুরুষ যে কেউ তা ছেড়ে দিলে গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে জামা'আতের সাথে তা আদায় করা সুন্নাতে কেফায়া হওয়ায় একদল লোক মসজিদে আদায় করে নিলে বাকিরা ঘরে পড়লে গুনাহগার হবে না। তবে জামা'আতের ফজীলত থেকে বঞ্চিত হবে। হ্যাঁ, যদি মহল্লার মসজিদে তারাবীর জামা'আতই না হয় তবে একাকী আদায় করলেও জামা'আত তরকের গুনাহ হবে।

আল্লামা শামী (রহ.) এভাবেই মাসআলাটি ব্যক্ত করেছেন–

قوله والجماعة فيها سنة على الكفاية الخ افاد ان اصل التراويح سنة عين فلو تركها واحدة كره، بخلاف صلاتها بالجماعة فانها سنة كفاية فلو تركها الكل اساء وا (شامى سعيد ٢/٤٥)

এখান থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, পাঞ্জেগানা নামাযের জামা'আতের সাথে তারাবীর জামা'আতকে তুলনা করা যাবে না। ফরয নামাযের জামা'আতের ব্যাপারে শরীয়তে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তারাবীর ক্ষেত্রে

তা দেওয়া হয়নি। ফরয নামায মসজিদের জামা'আতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে তারাবীর নামাযের জামা'আত সুন্নাতে কেফায়া। সাহাবায়ে কেরামের সমাজে ফরয নামাযের জামা'আত তরক করাকে মুনাফেকীর লক্ষণ মনে করা হতো। পক্ষান্তরে তারাবীর নামায ঘরে আদায় দোষের ছিল না। সাহাবাদের অনেকে নিজ গৃহে তারাবীর নামায আদায় করতেন।

كتاب المبسوط للسرخسى ١٤٥/٢ : قال ولو صلى انسان فى بيته لايأثم هكذا كان يفعله ابن عمرو وابراهيم والقاسم وسالم الصواف

তারাবীতে কোরআন খতম :

তারাবীর নামায একাকী বা জামা'আতের সাথে যেভাবেই পড়া হোক ছোট ছোট সূরা দিয়েই তা আদায় হয়ে যায়। নারী-পুরুষ, হাফেজ-গাইরে হাফেজ, আলেম বা সাধারণ মুসলমান সকলের জন্য তারাবীহ আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। পক্ষান্তরে তারাবীতে কোরআন খতম করা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সুন্নাত। এটি তারাবীর নামাযের মতো নারী-পুরুষ সকলের জন্য ব্যাপক আকারের সুন্নাত নয় বরং সহজে আদায়ের শর্ত সাপেক্ষে পালনযোগ্য একটি সুন্নাত। অর্থাৎ যদি মুসল্লিদের জন্য কষ্টকর না হয় এবং মুসল্লির সংখ্যা হ্রাসের শঙ্কা না হয়, তবে এই সুন্নাতের ওপর আমল করা যাবে। অন্যথায় ছোট সূরা দিয়ে পড়াতে হবে। এটাই ফকীহদের নির্ভরযোগ্য মত।

رد المحتار ٤٧/٢: (قوله الافضل فى زماننا الخ) لان تكثير الجمع افضل من تطويل القرآءة ـــ وفيه اشعار بان هذا مبنى على اختلاف الزمان۔

البحر الرائق ٦٨/٢: فالحاصل ان المصحح فى المذهب ان الختم سنة لكن لا يلزم منه عدم تركه اذا لزم منه تنفير القوم وتعطيل كثير من المساجد مجمع الانهر بيروت ١٣٧/١: الافضل فى زماننا ان يقرأ بما لا يؤدى الى تنفير القوم عن الجماعة لان تكثير الجماعة افضل من تطويل القراءة وبه يفتى۔

মোট কথা, তারাবীতে কোরআন খতমের সুন্নাতটি একটি ঐচ্ছিক ও ফজীলতের বিষয়। সহজে সম্ভব হলে খতম করবে। উত্তম হচ্ছে তিন খতম করা অন্যথায় দুই খতম করা। না পারলে অন্তত এক খতম করা সুন্নাত। আর যদি এক খতম করাও মুসল্লিদের জন্য কষ্টকর হয় তবে খতম না করে সূরা তারাবী পড়ে নেওয়া। এটাই শরীয়তের বিধান।

الدر المختار مع الشامى سعيد ٤٦/٢ والختم مرة سنة ومرتين فضيلة وثلاثا افضل ولا يترك الختم لكسل القوم لكن فى الاختيار الافضل فى زماننا قدر ما لا يثقل عليهم

খতম সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নয় :

তারাবীতে কোরআন খতমের শরয়ী বিধান কী? এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বা সাহেবাঈন (রা.) থেকে কোনো ধরনের উক্তি পাওয়া যায় না। তবে পরবর্তী ফকীহদের অধিকাংশের মতে এটা সুন্নাত তবে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নয়। কেননা মুয়াক্কাদা হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই।

اعلاء السنن ٦/٧: قلت فهذا يدل على ان المسئلة المذكورة ليست منقولة عن صاحب المذهب ويشير اليه قول صاحب الهداية ايضا الذى مر وهو واكثر المشائخ على ان السنة فيها الختم مرة حيث لم يعزه الى ظاهر الرواية او الى الامام او صاحبيه

وفيه ٦٥/٧: قلت معناه ان الختم ليس بسنة مؤكدة كالتراويح وهذا لا ينفى كونه سنة۔

হাকীমুল উম্মত হযরত মাও. আশরাফ আলী থানভীর (রহ.) মতেও তারাবীতে খতমে কোরআন সুন্নাতে মুয়াক্কাদা হওয়ার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। তিনি এ-সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে বলেন–

دوسرا تردد یہ تھا اور ہے کہ قائلین بالتأکید کی دلیل کیا ہے، سو اسی کو متعدد علماء سے استفسار کیا کرتا ہوں۔ (امداد الفتاوی ۱/۵۰۰)

যারা খতমে কোরআনকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বলে তাদের দলিল কি এ ব্যাপারে আমার যথেষ্ট দ্বিধা ছিল এবং এখনো আছে। তাই বিষয়টি আমি ওলামাদের কাছে জানতে ইচ্ছুক। (ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৫০০)

খতমের বিনিময় :

পূর্বের আলোচনায় তারাবীর নামায ও তাতে কোরআন খতমের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেছে। মূল নামাযের বিধান সকলের জন্য আর কোরআন খতমের বিষয়টি ঐচ্ছিক ও অধিক সাওয়াবের সাথে সম্পৃক্ত। যদি কেউ নিজে হাফেজ হয় তাহলে এর ওপর আমল করবে। অথবা সহজে কোনো হাফেজের পেছনে ইক্তিদা করা সম্ভব হলে ওই ফজীলত অর্জনের চেষ্টা করবে।

কোরআন খতমের এই অতিরিক্ত ফজীলত অর্জনের জন্য টাকা-পয়সা নিয়ে হাফেজ নিয়োগ দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে সমর্থনযোগ্য নয়। অনুরূপ খতম শোনার ফজীলত অর্জনের সুযোগ করে দিয়ে মুসল্লিদের কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণও হাফেজ সাহেবের জন্য বৈধ নয়। এ ক্ষেত্রে শরীয়তের মূলনীতি হচ্ছে– এমন ইবাদত, যা কোনো মুসলমান নিছক সাওয়াব লাভ তথা–পরকালের প্রতিদানের আশায় করে থাকে এর বিনিময় আদান-প্রদান বৈধ নয়। (তানকীহুল ফাতাওয়া হামিদিয়া ২/১৩৮)

ইসলামের দলিল চতুষ্টয়ের আলোকে :

এই মূলনীতির পক্ষে ইসলামের চার দলিল কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস এখানে তুলে ধরা হলো–

(ক) পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

ولاتشتروا بايٰتى ثمنا قليلا

এবং তোমরা আমার আয়াতসমূহ

কোনো নগণ্য বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করো না।" (সূরা আল-বাকারা-৪১)

قال ابو العالية : لا تأخذوا عليه اجرا (ابن كثير ١/٢٢٢)

অর্থাৎ কোরআনের পারিশ্রমিক গ্রহণ করো না। (ইবনে কাসির ১/২২২)

(খ) **সুন্নাহ :** হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত বুরাইদা (রা.) সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করে মানুষের কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করে কিয়ামত দিবসে তার চেহারায় শুধু হাড় পরিলক্ষিত হবে, তাতে কোনো মাংস থাকবে না। (মিশকাত ১৯৩)

অপর হাদীসে বলা হয়েছে নবীজি (সা.) বলেন, তোমরা কোরআন তেলাওয়াত করো, তবে এর দ্বারা পেট পালার ব্যবস্থা করো না। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা হা. ৭৮২৫)

(গ) ইজমা :

ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ হারাম হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কোরআন খতম করা অন্যতম একটি ইবাদত। এর দ্বারা পরকালে সাওয়াবের আশা করা হয়। চাই খতম তারাবীতে করা হোক বা নামাযের বাইরে। এ ধরনের খতমের বিনিময় গ্রহণ তাই বৈধ নয়।

تنقيح الفتاوى الحامدية ٢/١٣٨: فالاستيجار على الطاعات مطلقا لا يصح عند ائمتنا الثلاثة ولا شك ان التلاوة المجردة عن التعليم من اعظم الطاعات التى يطلب بها الثواب فلا يصح الاستيجار عليها

عمدة القارى ١٠/١٠٢: والاصل الذى بنى عليه حرمة الاستيجار على هذه الاشياء ان كل طاعة يختص بها المسلم لايجوز الاستئجار عليها۔

موسوعة القواعد الفقهية : ٧/٤٤٢: كل طاعة يختص بها المسلم فالاستئجار عليها باطل يختص المسلم بطاعات واجبة عليه او مندوبة۔

(ঘ) কিয়াস :

ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ নাজায়েয হওয়ার বিষয়টি ফকীহগণ কিয়াসের ভিত্তিতেও প্রমাণ করেছেন। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) বলেন, যেহেতু ইবাদত বান্দার নিজের পক্ষ থেকে সম্পাদিত হয় তাই এর সাওয়াবও সেই পায় বিধায় অন্যের কাছে এর বিনিময় গ্রহণ বৈধ নয়। যেমন নামায, রোযা আদায় করে বিনিময় গ্রহণ বৈধ নয়।

عمدة القارى ١٠/١٠٢: لان هذه الاشياء طاعة وقربة تقع عن العامل قال تعالى "وان ليس للانسان الا ما سعى" فلا يجوز اخذ الاجرة من غيره كالصوم والصلاة۔

আল্লামা শামী (রহ.) বলেন, ইজারা হচ্ছে মূলত (منافع) উপকারের ক্রয়-বিক্রয়। কোরআন তেলাওয়াতকারী সাওয়াব ব্যতীত উপকৃত হওয়ার মতো এমন কিছু পায় না, যা সে বিক্রয় করতে পারে। আর সাওয়াবের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। (তানকীহুল ফাতাওয়া আল হামিদিয়্যাহ ২/১৩৮)

لان الاستئجار بيع المنافع وليس للتالى منفعة سوى الثواب ولا يصح بيع الثواب

উল্লিখিত শরীয়তের চার দলিল থেকে কোরআন তেলাওয়াতের বিনিময় গ্রহণ অবৈধ প্রমাণিত হয়। চাই তা যেকোনোভাবেই তেলাওয়াত করা হোক, নামাযে বা নামাযের বাইরে। তারাবীর নামাযও এর অন্তর্ভুক্ত। এখানে নাম ধরে ধরে সকল ইবাদতের উল্লেখ নিস্প্রয়োজন। মৌলিক সূত্র বলে দেওয়াই যথেষ্ট।

তা সত্ত্বেও যদি কেউ বলে তারাবীর নামায কোরআন খতমের বিনিময় হারাম হওয়ার ভিন্ন কোনো দলিল নেই, তবে তাকে বলা হবে নতুন নতুন যত নেশাজাতদ্রব্য আবিষ্কার হচ্ছে তা হারাম হওয়ার ভিন্ন কোনো দলিল নেই। শুধু একটি মূলনীতি রয়েছে كل مسكر প্রত্যেক নেশাজাত দ্রব্য হারাম। ওই মূলনীতির ভিত্তিতে যেভাবে সকল ক্ষেত্রে হারামের হুকুম দেওয়া হয় অনুরূপ استئجار على الطاعات ইবাদতের বিনিময় হারাম এই মূলনীতির ভিত্তিতে তারাবীতে কোরআন খতম করে বিনিময় গ্রহণের হুকুম প্রদান করা হবে। এখানে এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই যে, উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসে (تلاوة مجردة) শুধু তেলাওয়াতের বিনিময় গ্রহণ নিষেধ করা হয়েছে। তারাবীর ইমামতির বিনিময়কে নয়। কেননা খতম তারাবীতে কোরআন খতমই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এ জন্যই হাফেজ নিয়োগ দেওয়া হয় আর পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়। হাফেজ সাহেব যদি ছোট সূরা দিয়ে সূরা তারাবী পড়িয়ে দেয় তবে কেউই তা মেনে নেবে না।

সাহাবাদের আমল :

তারাবীর বিনিময় গ্রহণ সাহাবায়ে কেরামের মতেও নাজায়েয ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এক রমাজানে লোকদের নিয়ে তারাবীহ পড়ালেন। এরপর ঈদের দিন উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ তাঁর কাছে একজোড়া কাপড় এবং পাঁচশত দিরহাম পাঠালেন। তিনি এগুলো ফেরত দিলেন এবং বললেন, আমরা কোরআনের বিনিময় গ্রহণ করি না।

অনুরূপভাবে হযরত আমর বিন নু'মান (রা.)-এর খেদমতে তারাবীতে কোরআন শোনানোর জন্য দুই হাজার দিরহাম পেশ করা হলে তিনি তা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, আমরা কোরআনকে দুনিয়া উপার্জনের জন্য পড়ি না। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা. ৭৭৩৭, ৭৭৩৮)

উলামায়ে দেওবন্দের ফাতাওয়া :

হযরত মাদানী (রহ.) বলেন, রমাজানে হাফেজদের জন্য বিনিময় গ্রহণ হারাম। তা'লীম, আযান বা ইমামতির বিনিময়ের

সাথে এর তুলনা করা যাবে না। কারণ এগুলো বন্ধ হয়ে গেলে দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পক্ষান্তরে তারাবীতে কোরআন খতম না করে তারাবী পড়া হলে নামায আদায় হয়ে যাবে, দ্বীনের কোনো ক্ষতি হবে না। তাই কোরআন খতমের বিনিময় গ্রহণ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। (সারসংক্ষেপ তাকরীরে তিরমিযী-৩১৭)

হযরত থানভী (রহ.) এ ধরনের খতম তারাবীসংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, এ ধরনের প্রথা বাতিল ও শরীয়তবিরোধী। এমন খতম দ্বারা সাওয়াব তো হবেই না, উল্টো গুনাহ হবে। (ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৩১৯)

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমি এই বিনিময় গ্রহণকে নাজায়েয মনে করি। (ইমদাদুল ফাতাওয়া)

মুফতী কেফায়াতুল্লাহ (রহ.) বলেন, তারাবীর বিনিময় দেওয়া যেহেতু জায়েয নয়, তাই এতে সাওয়াবের আশা করা যায় না। নাজায়েযভাবে এই বিনিময় গ্রহণ তাদের জন্য মাকরূহে তাহরিমী। (কিফায়াতুল মুফতী ৩/৪১২)

মুফতী আজিজুর রহমান (রহ.) বলেন, বিনিময় দিয়ে কোরআন তেলাওয়াত বৈধ নয়। এতে কোনো সাওয়াব নেই। যাদের নিয়্যতে লেনদেন আছে তা শর্ত করে নেওয়ার মতোই নাজায়েয। এমতাবস্থায় শুধু তারাবী পড়া এবং বিনিময়ের কোরআন শ্রবণ না করাই উত্তম। এতে তারাবীর ফজীলত পেয়ে যাবে। (ফাতাওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ ৪/১৪৬)

মুফতী মাহমুদ হাসান গাংগুহী (রহ.) বলেন, তারাবীর বিনিময় লেনদেন নাজায়েয। দাতা-গ্রহীতা উভয়ে গুনাহগার হবে এবং সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৭/১৭১)

খতম তারাবীহ কখন নিষেধ :

আকাবীরে দেওবন্দের ফাতাওয়ার মাঝে তারাবীর পারিশ্রমিক গ্রহণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারির পাশাপাশি এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যে, বিনিময় ছাড়া খতম তারাবীহ পড়ানোর মতো কোনো হাফেজ পাওয়া না গেলে সূরা তারাবীহ পড়ে নেবে। তবুও বিনিময় দিয়ে হাফেজ রাখা যাবে না। এমন পরিস্থিতিতে খতম তারাবীর ব্যবস্থাপনা নিষেধ।

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, মুসল্লি সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ হওয়ার ভয়ে যখন খতমের সুন্নাত ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তবে ইবাদতের বিনিময় গ্রহণের মতো গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য এ কথা কেন বলা হবে না যে সূরা তারাবীহ পড়ে নাও? (ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৪৮৪)

মুফতী মাহমুদ হাসান গাংগুহী (রহ.) বলেন, যদি বিনিময় ছাড়া শোনানোর মতো কাউকে পাওয়া না যায়। তবে সূরা তারাবীহ পড়ে নেবে। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৭/১৭১)

হিলা-বাহানা :

হাফেজ সাহেবকে তারাবীর বিনিময় দেওয়ার জন্য অনেকে বিভিন্ন হিলা করে থাকে। এর স্বপক্ষে দু-একটি ফাতাওয়া পেশ করা হয়। কিন্তু নির্ভরযোগ্য মতানুসারে এ ব্যাপারে কোনোরূপ হিলা-বাহানার অবকাশ নেই।

যেমন হাফেজ সাহেবকে পাঞ্জেগানা নামাযের দু-এক ওয়াক্তের ইমামতির দায়িত্ব দেওয়া একটি হিলা। এ ব্যাপারে হযরত থানভী (রহ.) বলেন, যদি প্রকৃত পক্ষে ইমামতিই উদ্দেশ্য হতো তবে এটা জায়েয হতো। অথচ এখানে উদ্দেশ্য খতমে তারাবীহ আর ইমামতি একটা হিলা মাত্র। দিয়ানতের ক্ষেত্রে তথা আল্লাহও বান্দার মাঝে যে মু'আমালা হয় শরীয়তের দৃষ্টিতে সেখানে হিলার দ্বারা কোনো কিছু বৈধ হয় না। তাই এটা নাজায়েয হবে। (ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৪৮৫)

আল্লামা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী দা.বা. ইমদাদুল ফাতাওয়ার টিকায় লেখেন, ফেকাহশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ মূলনীতি হচ্ছে– الامور بمقاصدها। তথা উদ্দেশ্য দেখে সিদ্ধান্ত প্রদান। হাফেজকে ইমাম বানানোর মূল উদ্দেশ্য ইমামতি নয়, বরং কোরআনের খতম। আর এটা নিছক হিলা, যা দিয়ানতের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই থানভী (রহ.)-এর ফাতাওয়াই সঠিক।

আরেকটি হিলা হচ্ছে, খেদমতের নামে বা হাদিয়ার নামে আদান-প্রদান। অনেক এলাকায় হাফেজের বিনিময় ঠিক করা হয় না। আল্লাহর ওয়াস্তে পড়ানোর দাবি করা হয় এবং পরে মুসল্লিরাও আল্লাহর ওয়াস্তে হাফেজের খেদমতের নামে নগদ বা কাপড়-চোপড় ইত্যাদি হাদিয়া দিয়ে থাকে। শরীয়তে এই পন্থা অবলম্বনেরও সুযোগ নেই।

মুফতী রশিদ আহমদ (রহ.) বলেন, খেদমতের নামে নগদ বা কাপড় ইত্যাদি প্রদানও বিনিময়ের অন্তর্ভুক্ত এবং বিনিময় ধার্য্য করার চেয়ে আরো মারাত্মক। কেননা এখানে ডবল গুনাহ হচ্ছে। একে তো কোরআন শোনানোর বিনিময় গ্রহণের গুনাহ, দ্বিতীয়ত এটাকে বিনিময় মনে না করার গুনাহ।

যারা বলে হাফেজ সাহেবও আল্লাহর ওয়াস্তে পড়ান আমরাও আল্লাহর ওয়াস্তে তার খেদমত করি। এ ধরনের হিলাবাজদের নিয়্যত যাচাইয়ের জন্য ফকীহগণ একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। যদি হাফেজদের কিছুই না দেওয়া হয় তাহলে পরের বছর ওই মসজিদে আসে কি না? আর মুসল্লিদের

পরীক্ষা হচ্ছে হাফেজ সাহেব যদি তাদের মসজিদে না আসে তবে তাদের খেদমত করা হয় কি না? বর্তমান সময়ে এভাবে পরীক্ষা করা হলে দেখা যাবে হাফেজরা ওই মসজিদে ফিরেও তাকাবে না। আর মুসল্লিদের অবস্থা এই, যদি হাফেজ তাদের মসজিদে কাজ না করে তবে সে যতই অভাবী হোক না কেন তার প্রতি দয়া করা হবে না। এতে বোঝা যায় উভয় পক্ষের নিয়ত পারিশ্রমিক আদান-প্রদান। আল্লাহর ওয়াস্তে খেদমতের দাবি মিথ্যা। এভাবে যারা শোনে বা শোনায় তারা ফাসেক ও মারাত্মক গুনাহগার। যদি কোনো হাফেজের প্রকৃতপক্ষেই পারিশ্রমিক গ্রহণের নিয়্যত না থাকে, তবুও লেনদেনের প্রথার কারণে কিছু পাওয়ার আশা থাকবে এবং না পেলে মনে মনে আফসোস হবে। এটাকে اشراف نفس এশরাফে নফস বলে যা হারাম। (আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৫১৪)

একটি ভুল কিয়াস :

অনেকে খতম তারাবীর বিনিময়কে পাঞ্জেগানা নামাযের ইমামতির বিনিময়ের সাথে তুলনা করে থাকেন, যা একটি ভুল কিয়াস। কেননা এখানে مقيس এবং مقيس عليه এ দু'য়ের মাঝে মিল নেই। ফরয নামাযের জামা'আত কায়েম করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে তারাবীতে কোরআন খতম করা ঐচ্ছিক ও ফজীলতের বিষয়। তারাবীহ শুদ্ধ হওয়ার শর্ত নয়। সূরা তারাবীহ পড়াই যথেষ্ট। তাহলে এ দুটি সমমানের হলো কী করে?

এ কারণেই পরবর্তী ফকীহগণ ফরয নামাযের ইমামতির বিনিময় গ্রহণ জরুরতের কারণে বৈধ বলেছেন আর খতম তারাবীর বিনিময় গ্রহণকে জরুরত না থাকায় অবৈধ বলেছেন।

হযরত মাদানীর (রহ.) মতে তালীম, আযান বা ইমামতির সাথে এর তুলনা করা ভুল। কারণ এগুলো বন্ধ হয়ে গেলে দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পক্ষান্তরে তারাবীতে কোরআন খতম করা না হলে দ্বীনের কোনো ক্ষতি নেই। সূরা তারাবীহ পড়ে নিলে আদায় হয়ে যাবে। (তাকরীরে তিরমিযী ৩১৭)

হযরত থানভীর (রহ.) মতে, তারাবীতে কোরআন খতম করা যেহেতু দ্বীনের মাঝে জরুরি কোনো বিষয় নয়। তাই জরুরতের কারণ দেখিয়ে এর বিনিময়ে বৈধতা প্রমাণ হতে পারে না। (ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৪৭৮)

মুহাদ্দিসে কাবীর মাও. যফর আহমদ ওসমানীর (রহ.) মতে, তারাবীর ইমামতির বিনিময় গ্রহণ বৈধ নয়। কেননা এখানে এমন কোনো শরয়ী জরুরত নেই, যার ভিত্তিতে কোরআন শিক্ষা, ফরয নামাযের ইমামতি বা আযানের বিনিময়কে বৈধ বলা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে ফরয বা সুন্নাতে মুয়াক্কাদার অন্তর্ভুক্ত, যা দ্বীনের শেয়ার বা বিশেষ লক্ষণ হিসেবে ধর্তব্য হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে তারাবীর ইমামতি সুন্নাতে কেফায়া এবং তারাবীহ ছোট ছোট সূরা দিয়েও আদায় হয়ে যায়। খতম করা শর্ত নয়। (ইমদাদুল আহকাম ৩/৫৫৯)

হাদীসের অপব্যাখ্যা :

আকাবীরে দেওবন্দ ও উম্মতের ফকীহগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে খতমের বিনিময় নাজায়েয জানা সত্ত্বেও অনেকে হাফেজদেরকে হারামে লিপ্ত করার জন্য মরিয়া হয়ে লেগেছে। ইদানীং নতুন নতুন মুহাক্কেক নিজেকে জাহির করার জন্য কোরআন হাদীসের আজগুবী ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়াস চালাচ্ছেন। এ ধরনের এক গবেষক বুখারী শরীফের প্রসিদ্ধ হাদীস যাতে ঝাড়-ফুঁকের বিনিময় গ্রহণের কথা ব্যক্ত হয়েছে, ওই হাদীস থেকে কোরআন খতমের বিনিময় বৈধ করার চেষ্টা করেছেন। এখানে হাদীসটি ব্যাখ্যাসহ পেশ করা হচ্ছে–

ইমাম বুখারী (রহ.) ওই হাদীসের শিরোনাম দিয়েছেন–

باب الشرط فى الرقية بقطيع من الغنم

"ঝাড়-ফুঁকের বিনিময়ে বকরীর পাল শর্ত করা।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, নবীজি (সা.)-এর কতেক সাহাবী পানির ধারে অবস্থিত একটি গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন।

সেখানে একজন সাপে কাটা রোগী ছিল। গোত্রের এক লোক এসে তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, আপনাদের কেহ ঝাড়-ফুঁক জানেন কি? আমাদের এক সাপে কাটা রোগী আছে। এক সাহাবী গিয়ে এক পাল বকরীর বিনিময়ে সূরা ফাতিহা দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করল। এতে লোকটি সুস্থ হয়ে গেল। বকরীগুলো নিয়ে সাথীদের কাছে ফিরে এলে সকলে তা অপছন্দ করল এবং বলল, তুমি তো কোরআনের বিনিময় গ্রহণ করলে। মদীনায় ফিরে তাঁরা অভিযোগ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) এই লোক আল্লাহর কিতাবের বিনিময় গ্রহণ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন–

ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله

কিতাবুল্লাহ বিনিময় গ্রহণের অধিকযোগ্য। (বুখারী ২/৮৫৪, হা. ৫৭৩৭)

এখানে সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শিরোনাম। তিনি এই হাদীস থেকে ঝাড়-ফুঁকের বিনিময়ের বৈধতা প্রমাণ করেছেন। অতএব তাঁর মতে হাদীসটি পার্থিব বিষয়ের বিনিময়সংক্রান্ত, ইবাদতসংক্রান্ত নয়। পক্ষান্তরে খতমে

কোরআন পার্থিব বিষয় নয় বরং একটি স্বেচ্ছা পালনীয় ইবাদত। তাই ইবাদতের বিনিময় গ্রহণের বৈধতা এ হাদীস থেকে প্রমাণের অবকাশ নেই।

আল্লামা কাশ্মীরী (রহ.) হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে অপর একটি বিষয় হচ্ছে, ঝাড়-ফুঁকের বিনিময় গ্রহণ। অতএব এটা বৈধ, কেননা তা ইবাদত নয়। (ফয়জুল বারী ৩/৫১৫)

আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) বলেন, হানাফীদের মতে তালীমের বিনিময় গ্রহণ নাজায়েয। আর ঝাড়-ফুঁকের বিনিময় গ্রহণ বৈধ। (ফাতহুল বারী ৪/৬২০)

আল্লামা বদরুদ্দীন আঈনী (রহ.) বলেন, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সূরা ফাতিহা ইত্যাদি দ্বারা ঝাড়-ফুঁকের বিনিময় গ্রহণকে নিষেধ করেন না। তিনি নিষেধ করেন, কোরআন শিক্ষার বিনিময়কে। আর তা'লীম ও ঝাড়-ফুঁক সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। এটা তাঁর একক মত নয় বরং আব্দুল্লাহ ইবনে শাক্বীক, আসওয়াদ ইবনে সা'লাবা, ইবরাহীমে নাখঈ, আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ, কাজী শুরাইহ ও হাসান ইবনে ইয়াহইয়ার অভিমতও তাই। (ওমদাতুল কারী ২১/২৬৪)

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, ঝাড়-ফুঁকের বিনিময়ের বৈধতার দ্বারা কোরআন শিক্ষার বৈধতা প্রমাণ হয় না। অনেকে

ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন–

يعنى اذا رقيتم به

কিতাবুল্লাহ দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করা হলে বিনিময় গ্রহণ বৈধ। (ওমদাতুল কারী ১০/১০৪)

আল্লামা বদরুদ্দীন আঈনী (রহ.) বলেন, বুখারীর হাদীস

ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله

আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত, অপর একটি হাদীস–

إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا (ابوداود ٣٤١٦)

দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। (ওমদাতুল কারী ১০/১০৩)

মোটকথা, হাদীস বিশারদগণ বুখারী শরীফের ওই হাদীসের কয়েকটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন–

১. হাদীসে বর্ণিত গোত্রের লোকেরা কাফির ছিল বিধায় তাদের কাছ থেকে মাল নেওয়া বৈধ হয়েছে।

২. তাদের ওপর মেহমানদারী কর্তব্য ছিল, যা তারা পালন করেনি বিধায় তাদের মাল নিয়ে আসা বৈধ হয়েছে।

৩. ঝাড়-ফুঁক ইবাদত নয় তাই এর বিনিময় গ্রহণ বৈধ হয়েছে।

৪. এখানে اجـــرا দ্বারা সাওয়াব উদ্দেশ্য বিনিময় নয়।

৫. হাদীসটি অপর হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। (কাশফুল বারী, ওমদাতুল কারী)

অতএব বুখারী শরীফের হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করে এর দ্বারা তারাবীতে কোরআন খতমের বিনিময় গ্রহণ বৈধ বলা যাবে না। হাদীসটি মূলত পার্থিব বিষয়ে কোরআনের বিনিময় গ্রহণ সংক্রান্ত।

নতুন সংশোধনী :

অনেকে ইবাদতের বিনিময় গ্রহণের ক্ষেত্রে নতুন আরেকটি সংশোধনীর মাধ্যমে তারাবীর বিনিময় বৈধ করার বিষয়ে মত প্রকাশ করে থাকে। তাদের দাবি হচ্ছে, ইবাদতের বিনিময় সর্বসম্মতভাবে নাজায়েয হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে পরবর্তী ফকীহগণ কোরআন শিক্ষা, ফরজ নামাযের ইমামতি ও আযানের বিনিময় গ্রহণের বৈধতার জন্য উক্ত মূলনীতির মাঝে সংশোধনী এনেছেন, অনুরূপ আরেকটি সংশোধনী এনে খতম তারাবীর বিনিময়কে বৈধ করা হোক।

তাদের এ দাবি অযৌক্তিক। কারণ ফকীহগণ যে সংশোধনী এনেছেন তা ছিল- شـعـــار اسـلام তথা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ পর্ব রক্ষার জরুরতকেন্দ্রিক। অথচ কোরআন খতম এমন কোনো জরুরত নয়। যার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।

তা ছাড়া ফকীহদের ওই সংশোধনী ছিল সীমিত আকারে প্রদত্ত ছাড়, সকল ইবাদতের ক্ষেত্রে ব্যাপক নয়। অন্যথায় টাকা দিয়ে ই'তিকাফে বসানো বা নামায রোযা করানোর বৈধতাও দিতে হবে। কারণ এসব বিষয়েও আজ ব্যাপক অবহেলা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

তাই ওই সংশোধনীর গণ্ডি সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। তারাবীর ক্ষেত্রে তাকে টেনে আনার অবকাশ নেই। আল্লামা শামী (রহ.) বলেন, পরবর্তী ফকীহদের ফাতাওয়া মতে জরুরতের কারণে কোরআন শিক্ষা, আযান ও ইমামতির বিনিময় বৈধ। পক্ষান্তরে তেলাওয়াতে কোরআন ও অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে জরুরত না থাকায় বিনিময় গ্রহণ বৈধ নয়। (শামী ১/৫৬২)

তিনি আরো বলেন, ফকীহদের ওই সংশোধনী উল্লিখিত বিষয়ের মাঝেই সীমাবদ্ধ, সকল ইবাদতের বেলায় প্রযোজ্য নয়। (শামী ৬/৫৬)

মুফতী আব্দুর রহিম লাজপুরী (রহ.) বলেন, পরবর্তী ফকীহগণ জরুরতের ভিত্তিতে কোরআন শিক্ষা, আযান ও ইমামতির মতো কয়েকটি বিষয়ে বিনিময় গ্রহণের বৈধতা দিয়েছেন। এই বৈধতার হুকুম ওই সকল বিষয়ের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তারাবীর কথা যেহেতু ওই সকল বিষয়ের মাঝে উল্লেখ নেই তাই মূল ফাতাওয়া অনুযায়ী তারাবীর বিনিময় আদান-প্রদান নাজায়েয থাকবে। (ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া ৪/৪২২, ইমদাদুল মুফতীন ২১৩)

মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার-১৪

মুফতী ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী

প্রত্যেক ইমামই তাঁকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন

প্রত্যেক ইমামই তাঁর অনুসারীদেরকে বলেছেন, তোমরা আমার অনুসরণ করো না। ডা. জাকির নায়েক মাযহাবের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তি উপস্থাপন করেছেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি অভিযোগ হলো, প্রত্যেক ইমামই তাঁকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন, সুতরাং আমরা কেন তাদের অনুসরণ করব? এ প্রসঙ্গে আমরা সর্বপ্রথম ইমামদের বক্তব্যগুলো উপস্থাপন করব এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করব।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর বক্তব্য

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) থেকে বেশ কিছু উক্তি বর্ণিত আছে, যেখানে তিনি তাঁর কথা অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন।

لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه

কারও জন্য আমাদের কথা গ্রহণ করা বৈধ হবে না, যতক্ষণ না সে আমরা কোথা থেকে সেটি গ্রহণ করেছি, সে সম্পর্কে অবগত হবে?

তিনি আরো বলেন,

ويحك يا يعقوب (هو أبو يوسف) لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي

হে ইয়াকুব! তোমার ধ্বংস হোক! আমার নিকট থেকে যা শোনো, তাই লিপিবদ্ধ করো না, কেননা আমি আজ যে মতটা পছন্দ করি, কাল তা ত্যাগ করি। কাল এক মত গ্রহণ করি, পরশু সেটিও ত্যাগ করি। আমি যদি কখনও এমন কথা বলি, যা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বিপরীত হয়, তবে আমার কথা পরিত্যাগ করো।

ইমাম মালেক (রহ.)-এর বক্তব্য

এ ব্যাপারে ইমাম মালেক (রহ.) বলেছেন,

إنما أنا بشر أخطء وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه

নিশ্চয়য় আমি একজন মানুষ, আমি ভুলও করি আবার সঠিকও করি। সুতরাং তোমরা আমার মতামতের প্রতি লক্ষ রাখবে! আমার যে মতটি কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী, সেটি গ্রহণ করো এবং যেটি কোরআন ও সুন্নাহের বিপরীত, তা পরিত্যাগ করো।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর বক্তব্য

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) রাসূল (সা.)-এর অনুসরণ প্রসঙ্গে বলেন,

إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت وفي رواية فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد

আমার কিতাবে যদি রাসূলের সুন্নাতের খেলাফ কোনো কথা পাও, তবে তোমরা সুন্নাহের ওপর আমল করো এবং আমি যা বলেছি, সেটি ত্যাগ করো।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর বক্তব্য

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ইমামদের তাকলীদ প্রসঙ্গে বলেন,

لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا

তোমরা আমার অনুসরণ করো না এবং ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আওযায়ী, সুফিয়ান সাওরী (রহ.) এদেরও অনুসরণ করো না। তারা যেখান থেকে গ্রহণ করেছে, তোমরাও সেখান থেকে গ্রহণ করো।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেছেন,

لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير

তোমার দ্বীনের ব্যাপারে এদের কারও অনুসরণ করো না, রাসূল (সা.) এবং তার সাহাবীগণ যা নিয়ে এসেছেন, সেগুলো গ্রহণ করো। অতঃপর তাবেঈগণের অনুসরণ করো, তবে এ ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীন?

যুক্তির দাবি হলো, প্রত্যেক ইমাম যেহেতু তাকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন, সুতরাং তাদেরকে অনুসরণ করা কিভাবে বৈধ হয়? আর বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, তাদের নিষেধ সত্ত্বেও সমগ্র মুসলিম উম্মাহ কেন তাদের অনুসরণ করে! দীর্ঘ বার-তের শ' বছর যাবৎ মুসলিম উম্মাহ কেন ইমামদের মাযহাব অনুসরণ করল? অথচ স্বয়ং ইমামগণ তাদেরকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন!

প্রথমতঃ লক্ষ করার বিষয় হলো, ইমামগণ যদি তাদের অনুসরণ করতে নিষেধ নাও করতেন, কিংবা যদি ধরে নেই যে, পৃথিবীতে কোনো মাযহাব নেই, তবে কি কারও পক্ষে ইজতেহাদের যোগ্যতা অর্জন না করে মাসআলা দেওয়া জায়েয হবে? কারও পক্ষে কি কোরআন ও হাদীসের বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন না করে ফাতওয়া দেওয়া বৈধ হবে?

পৃথিবীর সব উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, 'শরীয়তের বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন না করে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া জায়েয নেই।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) ই'লামুল মুয়াককি'য়ীনে এ বিষয়ে আলাদা একটা পরিচ্ছদ তৈরি করেছেন এবং এর শিরোনাম দিয়েছেন,

تحريم القول على الله بغير علم

'আল্লাহ সম্পর্কে না জেনে কথা বলা হারাম?

এ শিরোনামের অধীনে শরীয়তের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন না করে ফাতওয়া বা মাসআলা প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) এ শিরোনামের অধীনে লিখেছেন,

وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم فى الفتيا والقضاء وجعله من أعظم المحرمات بل جعله فى المرتبة العليا منها فقال تعالى (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ .وهو القول عليه بلا علم وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم فى أسمائه وصفاته وأفعاله وفى دينه وشرعه

'আল্লাহ তা'আলা ফাতওয়া ও বিচারের ক্ষেত্রে না জেনে কোনো কথা বলাকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। এবং একে বড় বড় কবিরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন বরং একে কবিরা গোনাহের প্রথম স্তরে রেখেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

'আপনি বলে দিন : আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন, যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ, অন্যায়-অত্যাচার, আল্লাহ্র সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোনো সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ্র প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জানো না।'

এখন কারও জন্য যদি যথেষ্ঠ যোগ্যতা অর্জন না করে ফাতওয়া দেওয়া জায়েয না হয়, তবে একজন সাধারণ মানুষ যে সরাসরি কোরআন ও সুন্নাহ থেকে মাসআলা বের করতে পারে না, সে কী করবে?

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেছেন,

"إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة و التابعين فلا يجوز أن يعمل بما شاء ويتخير فيقضى به ويعمل به حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به فيكون يعمل على أمر صحيح"

'যদি কারও নিকট রাসূল (সা.)-এর লিখিত হাদীসের কিতাবসমূহ থাকে এবং সাহাবা, তাবেঈ, তাবেতাবেঈনদের মতপার্থক্য যদি তার জানা থাকে, তবে তার জন্য যেকোনো একটাকে গ্রহণ করে তার ওপর আমল করা কিংবা তার দ্বারা বিচার করা জায়েয হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করবে যে, কোনটি গ্রহণ করবে? অতঃপর সে সঠিকটার ওপর আমল করবে।

[ই'লামুল মুয়াককি'য়ীন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৪]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন,

"لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة"

'কোরআন ও সুন্নাহের ইলম ব্যতীত কারও জন্য ফাতওয়া বা মাসআলা দেওয়া জায়েয নেই।'

[ই'লামুল মুয়াককি'য়ীন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৫]

"ينبغى لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم وإلا فلا يفتى"

'যে ফাতওয়া দেবে তার জন্য পূর্ববর্তীদের কথা অবগত না হয়ে ফাতওয়া দেওয়া উচিত নয়।'

সুতরাং এ সমস্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, প্রত্যেকেই ফাতওয়া বা মাসআলা দিতে পারবে না। বরং এর জন্য যারা যোগ্য, একমাত্র তারাই ফাতওয়া দেবে। সুতরাং ইমামদের এ সমস্ত বক্তব্য থেকে এ উদ্দেশ্য নেওয়া যে, তারা যোগ্য-অযোগ্য প্রত্যেককে সরাসরি কোরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা বের করতে বলেছেন এবং তাদেরকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন, এটি তাদের কথার অপব্যাখ্যার নামান্তর।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) একদিকে বলছেন যে, চার লাখ হাদীস মুখস্থ না করে এবং উলামাদের বক্তব্য ও মতবিরোধ সম্পর্কে অবগত না হয়ে কেউ মাসআলা দিতে পারবে না, অন্যদিকে তিনি কাউকে অনুসরণ করতে নিষেধ করছেন, সুতরাং এ বিষয় দুটির মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করলেই তাদের এ সমস্ত বক্তব্যের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রত্যেক ইমামের নিকট মুজতাহিদ হওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট শর্ত রয়েছে। এ সমস্ত শর্ত কারও মাঝে বিদ্যমান না থাকলে তার জন্য শরীয়তের বিষয়ে মাসআলা দেওয়া বৈধ নয়। অতএব, ইমাম আহমাদ ইবনে (রহ.) যখন মাসআলা দেওয়ার জন্য ইজতেহাদের যোগ্য হওয়ার শর্ত দিয়েছেন। সুতরাং তিনি কখনও ইজতেহাদের অযোগ্য লোককে এ কথা বলতে পারেন না যে, 'ইমামদের অনুসরণ করো না।'

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, ইমামগণ এখানে কাদেরকে উদ্দেশ করে বলেছেন এবং তাদেরকে কী নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমামগণ কাদেরকে উদ্দেশ করে এ নির্দেশ প্রদান করেছেন :

ইমামগণ যে তাঁদেরকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন, এ নিষেধাজ্ঞা কাদের জন্য প্রযোজ্য, সেটি আমাদের নিকট স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তাঁদের এমন ছাত্রদেরকে তাঁরা এ নির্দেশ প্রদান করেছেন, যাদের অধিকাংশই ছিলেন ইজতেহাদের যোগ্য। এবং প্রত্যেকেই সরাসরি কোরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা বের করার যোগ্য ছিলেন।

একজন মুজতাহিদ কখনই আরেক মুজতাহিদকে এ কথা বলতে পারেন না যে, 'তুমি আমার অনুসরণ করো'। যেমন একজন সায়েন্টিস্ট আরেকজন সায়েন্টিস্টকে বলতে পারেন না যে, তুমি আমার গবেষণার ওপর নির্ভর করো। বরং প্রত্যেকেই নিজস্ব গবেষণার আলোকে সিদ্ধান্ত দেবেন।

এ ক্ষেত্রে লক্ষ করতে হবে যে, তিনি কাকে উদ্দেশ করে বলেছেন এবং কী বলেছেন। ইমামগণ তাদের ছাত্রদের উদ্দেশে বলেছেন, তোমরাও গবেষণা করো। শুধুমাত্র আমার কথার ওপর নির্ভর করো না। সুতরাং যারা সরাসরি কোরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা বের করতে পারে না অর্থাৎ যারা মুজতাহিদ নয়, তাদের জন্য এ কথাকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করাটা নিতান্তই বোকামি।

قال ابو داود :قلت لأحمد " :الأوزاعى اتبع أم مالكا؟ قال " :لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء !!ما جاء عن النبى ﷺ فخذ به "

যেমন ইমাম আবু দাউদ (রহ.) ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমি ইমাম মালেককে অনুসরণ করব নাকি ইমাম আওযায়ীকে?

ইমাম আহমাদ (রহ.) উত্তর দিলেন,

"لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء !!ما جاء عن النبى ﷺ فخذ به "

দ্বীনের ব্যাপারে এদের কারও অনুসরণ করো না। রাসূল (সা.) থেকে যা কিছু এসেছে, সেগুলো গ্রহণ করো।'

[ই'লামুল মুওয়াককি'য়ীন, আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (রহ.), খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২০০]

এখানে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ইমাম আবু দাউদকে বলেছেন, তুমি তাদের অনুসরণ করো না। ইমাম আবু দাউদের মতো বিখ্যাত মুহাদ্দিসকে নিষেধ করেছেন। এমন নয় যে, যাদের শরীয়তের বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই, কিংবা যাদের জ্ঞান সীমিত, তাদের জন্য এ কথা বলা হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইমাম মুযানী (রহ.) কে বলেছেন,

قال الشافعى للمزنى " :يا إبراهيم، لا تقلدنى فى كل ما اقول !!وانظر فى ذلك لنفسك فإنه دين ."

'হে ইবরাহীম! আমার প্রত্যেকটি কথার ওপর আমল করো না। বরং সে ব্যাপারে তুমিও চিন্তা করো। কেননা এটি দ্বীন।

[আল-মাল মাদখাল লিদিরাসাতিশ শরীয়াতিল ইসলামিয়া, আহমাদ শাফেয়ী, পৃষ্ঠা-১০৫]

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর এ বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইমামগণ কাদেরকে কী উদ্দেশ্যে তাদেরকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। আমাদের সময়ে কেউ যদি ইমাম মুযানি (রহ.) যে যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন, তার তিন ভাগের এক ভাগও অর্জন করতে সক্ষম হয়, তবে তার জন্য হয়তো এ কথা মেনে নেওয়া সম্ভব যে, সে ইমামদের তাকলীদ করবে না। কিন্তু অযোগ্য লোকদের জন্য এ বিষয়টি কোনোভাবেই প্রযোজ্য নয়।

ইমামগণ কী বলেছেন :

ইমামগণ তাদেরকে অনুসরণ করতে যে নিষেধ করেছেন, তাদের এ সমস্ত বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশ হলো,

وخذ من حيث أخذوا

'তারা যেমন সরাসরি কোরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা গ্রহণ করেছে, তোমরাও সেখান থেকে মাসআল গ্রহণ করো।'

এ নির্দেশ তাদেরকেই প্রদান করা হয়েছে, যারা সরাসরি কোরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা গ্রহণের যোগ্য অর্থাৎ যারা মুজতাহিদ।

মূল বিবেচনার বিষয় এটিই। ইমামগণ শুধু তাদের অনুসরণ করতে নিষেধ করেননি, সাথে সাথে এও বলেছেন, তোমরা কোরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা গ্রহণ করো।

সুতরাং যারা মুজতাহিদ নয়, তাদের মুখে এ ধরণের কথা কখনও শোভা পায় না যে, ইমামগণ তাদেরকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফকে নিষেধ করেছেন, যিনি একজন বিখ্যাত মুজতাহিদ ছিলেন। তিনি আমাদের মতো অন্ধ-মূর্খদেরকে বলেননি যে, আমাদের অনুসরণ করো না। তাদের উদ্দেশ্য যদি সেটিই হতো, তবে তারা জীবনেও কখনও কোনো ফাতওয়া দিতেন না। কেননা, অনুসরণের বিষয় আসে পরে। ইমাম ফাতওয়া না দিলে, মানুষ অনুসরণই করতে পারত না। ইমামগণ সর্বসাধারণকে যদি সরাসরি কোরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করতে বলতেন তবে তাদের নিকট কেউ মাসআলা জিজ্ঞেস করতে এলে বলে দিতেন, 'কোরআন ও হাদীস দেখে নাও'।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, তারা সাধারণ মানুষের জন্য গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী উলামাদের অনুসরণকে আবশ্যক মনে

করতেন। কেননা এ ব্যাপারে সকল যুগের সকল উলামা একমত যে, শরীয়তের বিষয়ে অনুমান করে কোনো মাসআলা দেওয়া জায়েয নেই।

সুতরাং যারা মুজতাহিদ নয়, তাদের জন্য এ নির্দেশনা নয়। বরং এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যারা মুজতাহিদ নয়, তাদের জন্য অন্যের অনুসরণ করা জরুরি।

কিন্তু আমাদের সমাজে একশ্রেণীর অজ্ঞ লোক রয়েছে, যারা নিজেদেরকে শরীয়তের বিষয়ে অনেক বড় জ্ঞানী মনে করে, তারা নিজেদেরকে মহা জ্ঞানী মনে করলেও তারা যে জানে না কিংবা খুব কম জানে, সেটিও তারা জানে না।

এ সম্পর্কে শেখ সা'দী (রহ.) বলেছেন-

خواجہ پندارد کہ حاصلے اوست
حاصلے خواجہ بجز پندار نیست

'অর্থাৎ খাজা ধারণা করেছে যে, তার অনেক জ্ঞান অর্জিত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তার এই ধারণাটুকু ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হয়নি।'

এ বিষয়ে প্রত্যেকের সুস্পষ্ট ধারণা রাখা উচিত যে, ইমামগণ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এ সমস্ত কথা বলেননি, যারা ইজতেহাদের যোগ্য নয়। অথচ বর্তমান সময়ে দু-একটি হাদীস পড়ে, হাদীসের দু-একটি কিতাব পড়ে, মুজতাহিদ হওয়ার দাবি করে বলেন যে, ইমামগণ তাদেরকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন।

ইমামগণ সে সমস্ত লোককে কিভাবে সরাসরি কোরআন ও হাদীস অনুসরণের নির্দেশ দেবেন, যারা কোরআন ও হাদীসের ব্যাপারে অজ্ঞ ও মূর্খ লোকদের কাতারে। কেউ যদি ইমামদের এ সমস্ত বক্তব্যকে অসৎ উদ্দেশ্যে সর্বসাধারণের জন্য প্রয়োগ করতে চায়, তবে সে নিঃসন্দেহে ইমামের ওপর মিথ্যারোপ করল।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর নিম্নের বক্তব্য থেকে বিষয়টি আমাদের নিকট সুস্প হয়ে উঠবে–

আল্লামা মাইমুনী (রহ.) বলেন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) আমাকে বলেছেন,

يا أبا الحسن !إياك أن تتكلم فى مسألة ليس لك فيه إمام

'হে আবুল হাসান! যে মাসআলায় তোমার কোনো ইমাম নেই, সে মাসআলায় সম্পর্কে কিছু বলা থেকে বিরত থাকো।

আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে–

من تكلم فى شىء ليس له فيه إمام أخاف عليه الخطأ

'যে ব্যক্তি এমন বিষয়ে কথা বলল, যে বিষয়ে তার কোনো ইমাম নেই, তবে আমি তার ভুল করার ব্যাপারে ভয় করছি?

[আল-ফুরু, আল্লামা ইবনে মুফলিহ্ (রহ.), খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৮০]

إنما هو يعنى العلم ما جاء من فوق

হযরত আছরম (রহ.) বলেন, 'ইমাম মালেক (রহ.) পূর্ববর্তীদের থেকে বর্ণিত ইলমকেই ইলম বলতেন।'

[আল-আদাবুশ শরইয়্যাহ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬২]

এ সমস্ত বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট যে, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) তাঁর এক ছাত্রকে বলছেন, কারও অনুসরণ করো না, সরাসরি কোরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করো, আরেকজনকে বলছেন, কোনো ইমামের অনুসরণ ব্যতীত কোনো মাসআলা প্রদান করো না। তবে কি তিনি স্ববিরোধিতার আশ্রয় নিয়েছেন? কখনও নয়। বরং তিনি যে ইজতেহাদের যোগ্য, যে সরাসরি কোরআন ও সুন্নাহ থেকে মাসআলা বের করতে সক্ষম তাকে বলেছেন, তুমি কাউকে অনুসরণ করো না, সরাসরি কোরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করো। অথচ বর্তমান সময়ে মাসআলা বের করা তো দূরে থাক, শরীয়তের ইলমের ক্ষেত্রে যার অবস্থান পাতালে, সে নিজেকে মনে করে যে, সে ছুরাইয়্যা তারকার ওপর রয়েছে।

ইমাম মালেক (রহ.)-এর নিচের উক্তিটি লক্ষ করুন!

عن خلف بن عمرو قال سمعت مالك بن أنس يقول :ما أجبت فى الفتيا حتى سألت من هو أعلم منى هل يرانى موضعا لذلك، سألت ربيعة و سألت يحى بن سعيد، فأمرانى بذلك فقلت له :يا أبا عبد الله !فلو نهوك؟ قال : كنت أنتهى ، لا ينبغى لرجل أن يرى نفسه أهلا لشىء حتى يسأل من هو أعلم منه

'খালাফ ইবনে উমর (রহ.) বলেন, আমি ইমাম মালেক (রহ.) কে বলতে শুনেছি- 'আমি ততক্ষণ পর্যন্ত ফাতওয়া দেইনি, যতক্ষণ না আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানীজনকে জিজ্ঞেস করেছি যে, তারা আমার অবস্থানকে সঠিক বলেন কি না। আমি রবীয়া (রহ.) এবং ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রহ.) কে জিজ্ঞেস করতাম। তারা আমাকে এ বিষয়ে নির্দেশ দিতেন।

খালাফ ইবনে আমর (রহ.) বলেন, আমি ইমাম মালেক (রহ.) কে জিজ্ঞেস করলাম, যদি তারা আপনাকে নিষেধ করতেন? ইমাম মালেক (রহ.) উত্তর দিলেন, 'তবে আমি ফাতওয়া থেকে বিরত থাকতাম।' কারও জন্য কোনো বিষয়ে নিজেকে যোগ্য মনে করা উচিত নয়, যতক্ষণ না সে তার চেয়ে যোগ্য কাউকে জিজ্ঞেস করে।'

[আল-হিলইয়া, আল্লামা আবু নুয়াইম (রহ.), খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩১৬]

এ বিষয়ে আমাদেরকে লক্ষ করতে হবে

যে, ইমামগণ যাদেরকে বলেছেন, 'তোমরা অনুসরণ করো না', তারা ইমামগণের এ সমস্ত নির্দেশ থেকে কী বুঝেছেন? ইমাম আবু হানীফা (রহ.) তাঁর ছাত্র ইমাম আবু ইউছুফ (রহ.) কে বলেছেন–

لا تكتب كل ما تسمع منى

'তুমি আমার নিকট থেকে যা শ্রবণ করো, যাচাই-বাছাই না করে তা লিপিবদ্ধ করো না।'

ইমাম আবু ইউছুফ (রহ.) এ নির্দেশের কারণে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাসআলা লেখা বাদ দিয়েছেন? ইমাম আবু দাউদকে (রহ.) কে ইমাম আহমাদ (রহ.) কারও অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন, ইমাম আবু দাউদ কি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মাযহাব ছেড়ে দিয়েছেন?

এভাবে ইমামগণ যাদেরকেই এ নির্দেশ দিয়েছেন, তাদের কেউ যদি সংশ্লিষ্ট ইমামের অনুসরণ থেকে বিরত না হয়, তবে আমরা কেন ইমামদের এ সমস্ত বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করে থাকি? এবং কেন মানুষকে মাযহাববিদ্বেষী করতে এ ধরনের উক্তির আশ্রয় নিয়ে থাকি?

এ ক্ষেত্রে আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.)-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর নিকট মুজতাহিদ হওয়ার জন্য যে সমস্ত শর্ত রয়েছে, সেগুলো উল্লেখ করে লেখেছেন–

فإن أنت قبلت هذه النصيحة و سلكت الطريقة الصحيحة، فلتكن همتك: حفظ ألفاظ الكتاب و السنة، ثم الوقوف على معانيها بما قال سلف الأمة و أئمتها، ثم حفظ كلام الصحابة و التابعين و فتاويهم و كلام أئمة الأمصار و معرفة كلام الإمام أحمد و ضبطه بحروفه و معانيه و الأجتهاد على فهمه و معرفته، و أنت إذا بلغت من هذه الغاية فلا تظن أنك قد بلغت النهاية، و إنما أنت طالب متعلم من جملة الطلبة المتعلمين و لو كنت بعد معرفة ما عرفت موجودا فى زمن الإمام أحمد، ما كنت حينئذ معدودا من جملة الطالبين .فإن حدثتك نفسك بعد ذلك أنك قد إنتهيت أو وصلت ما وصل إليه السلف فبأس ما رأيت

'তুমি যদি আমার নসীহত গ্রহণ করে থাকো এবং সঠিক পথের অনুসন্ধানী হয়ে থাকো, তবে তোমার লক্ষ্য থাকবে– তুমি কোরআন ও সুন্নাহর সমস্ত বিষয় মুখস্থ ও আয়ত্ত করবে, অতঃপর পূর্ববর্তীগণ ও ইমামগণ কোরআন ও সুন্নাহের যে অর্থ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে অবগত হবে, অতঃপর তুমি সাহাবী, তাবেঈনদের বক্তব্য ও তাদের ফাতওয়াসমূহ মুখস্থ করবে এবং বিভিন্ন শহরের উলামায়ে কেরামের যে সমস্ত বক্তব্য রয়েছে, সেগুলোও মুখস্থ করবে। সাথে সাথে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর বক্তব্য মুখস্থ করবে, তার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করবে এবং তার মর্ম উদ্‌ঘাটনে তুমি তোমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। তুমি এ সমস্ত কিছু করার পরে মনে করো না যে, তুমি শেষ স্তরে পৌঁছে গেছ, বরং তুমি তখনও অন্য শিক্ষার্থীদের মতো একজন সাধারণ শিক্ষার্থী। তুমি এসব কিছু অর্জনের পরও যদি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর যুগে থাকতে, তবে তুমি তাঁর ছাত্র হওয়ার যোগ্য হতে না। উপরোক্ত বিষয়ের ইলম অর্জনের পরে যদি তোমার অন্তরে এ ধারণার সৃষ্টি হয়, তুমি ইলমের চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে গেছ, কিংবা পূর্ববর্তীগণ যে স্তরে পৌঁছেছিলেন, সে স্তরে পৌঁছে গেছ, তবে তুমি বড়ই নিকৃষ্ট ধারণা পোষণকারী।'

'ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.) তাঁর নিজের সময়ের অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখেছেন,

كما هو حال أهل الزمان بل هو حال أكثر الناس منذ أزمان، مع دعوى كثير منهم الوصول إلى الغايات و الإنتهاء إلى النهايات و أكثرهم لم يرتقوا عن درجة البدايات

অর্থাৎ 'বর্তমান সময় কিংবা পূর্বের কয়েক যুগ থেকে কিছু লোক দাবি করে থাকে যে, তারা শরীয়তের ইলমের ক্ষেত্রে সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত স্তরে উন্নীত হয়েছে, অথচ বাস্তবতা হলো, তাদের অধিকাংশ এখনও প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করতে পারেনি।'

তিনি উপদেশ দিয়ে বলেছেন,

إياك و إياك :أن تترك حفظ هذه العلوم المشار إليها و ضبط االنصوص و الآثار المعمول عليها ، ثم تشتغل بكثير الخصام و الجدال، و كثرة القيل و القال و ترجيح بعض الأقوال على بعض الأقوال مما استحسنه عقلك ....ولا تكن حاكما على جميع فرق المؤمنين، كأنك قد أوتيت علما لم يؤتوه أو وصلت إلى مقام لم يصلوه.

'সাবধান! সাবধান! পূর্বোক্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন না করে এবং কোরআন ও সুন্নাহের নস ও আমলে মুতাওয়ারিছা (শ্রেষ্ঠ তিন যুগ থেকে প্রচলিত আমল) সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন না করে (অর্থাৎ মুজতাহিদ না হয়ে) তুমি তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকো। আর বেঁচে থাকো দ্বীনের ব্যাপারে অমূলক প্রশ্ন ও মন্তব্য থেকে। এবং তোমার পছন্দ অনুযায়ী এক ইমামের বক্তব্যকে আরেক ইমামের বক্তব্যের ওপর প্রাধান্য দেওয়া থেকে। মুমিনদের সকল দলের ব্যাপারে তুমি বিচারক সেজো না! তোমার ভাবখানা এমন যে, তুমি এমন ইলমের অধিকারী হয়েছো, যা পূর্ববর্তী কেউ অর্জন করেনি,

তোমার কাছে এমন এলম পৌঁছেছে, যা পূর্ববর্তীদের কাছে পৌঁছেনি।

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.)-এর এ উপদেশ সকলের হৃদয়ে গেঁথে নেওয়া উচিত। আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.)-এর জন্ম ৭৩৬ হি. এবং মৃত্যু ৭৯৫ হি. অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় সাত শ' বছর পূর্বে তিনি এ কথাটি বলেছেন। অতএব, আমাদের সময়ের এ সমস্ত স্বশিক্ষিত এবং তথাকথিত মুজতাহিদ ইমামদের সম্পর্কে তাদের মন্তব্য কী হতো?

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) লেখেছেন,

وقد قال بعض الناس :أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ، ونصف متفقه ، ونصف متطبب ، ونصف نحوى ، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان ، وهذا يفسد الأبدان ، وهذا يفسد اللسان)

'দুনিয়াকে সবচেয়ে বেশি ধ্বংস করেছে, আধা বক্তা, আধা ফকীহ, আধা ডাক্তার এবং আধা ভাষাবিদ। এদের একজন (আধা বক্তা) দ্বীনকে ধ্বংস করে, অপরজন (আধা ফকীহ) দেশ ও জাতিকে ধ্বংস করে। আধা ডাক্তার মানুষের শরীরকে নিঃশেষ করে। আর আধা ভাষাবিদ ভাষাকে বিনষ্ট করে।'

[মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১১৮]

আমাদের সমাজে শরীয়তের জ্ঞানের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ শিশু। অনেকেই এখনও ক্লাস ওয়ানে ওঠারও যোগ্যতা অর্জন করেনি। অথচ ভাবখানা এমন যে উক্ত বিষয়ে ডক্টরেট করেছেন। তাঁরা ডক্টরেট করেন এক বিষয়ে আর সিদ্ধান্ত দেন আরেক বিষয়ে। সারা জীবন ইঞ্জিনিয়ার থেকে প্রেসক্রিপশন দিতে গেলে যা হয় আর কী!

এ জন্যই হয়তো রবীয়া ইবনে আবু আব্দুর রহমান (রহ.) বলেছেন,

الناس فى حجور علمائهم كالصبيان فى حجور أمَّهاتهم

'মায়ের কোলে যেমন শিশু, তেমনি আলেমদের কোলে সাধারণ মানুষ।'

[শরহু ইবনু আবিল ঈয, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১০৫]

মুজাহেদ (রহ.) বলেছেন,

ذهب العلماء فلم يبق إلَّا المتكلِّمون ، والمجتهد فيكم كاللاعب فيمن كان قبلكم

'আলেমগণ গত হয়েছেন, এখন শুধু বক্তারা রয়ে গেছে, আর তোমাদের মাঝে যারা 'মুজতাহিদ' রয়েছে, পূর্ববর্তীদের তুলনায় তারা তামাশাকারী।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : ঋণ প্রদান

মুহা: যাকারিয়া
ফুলপুর, মোমেনশাহী।

জিজ্ঞাসা-১

'তাবিতা' নামক একটি সংস্থা এই নিয়মে ঋণ দিয়ে থাকে, কোনো ব্যক্তি দশ হাজার টাকা ঋণ নিতে চাইলে উক্ত ব্যক্তিকে সরাসরি ঋণ না দিয়ে উক্ত সংস্থা দশ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করে ঋণগ্রহীতার নিকট পনের হাজার টাকা বাকিতে বিক্রয় করে কিস্তি আকারে পরিশোধের শর্তে। তারপর উক্ত পণ্য ঋণগ্রহীতার প্রয়োজন না থাকলে দোকানির কাছে তুলনামূলক কম মূল্য বিক্রয় করে টাকা হস্তগত করে। এখন জানার বিষয় হলো, এ ধরনের লেনদেন সুদের অন্তর্ভুক্ত কি না। হলে বৈধ হওয়ার সূরত কী?

সমাধান-১

দোকানদার থেকে মাল ক্রয় করে সংস্থা কর্তৃপক্ষ কবজ করার পর ঋণগ্রহীতার কাছে বাকিতে লাভে বিক্রি করলে তা সহীহ হবে, অতঃপর বাকিতে ক্রয়কারী উক্ত মাল করায়ত্ত করার পর তার প্রয়োজন না থাকলে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে কম মূল্যে বিক্রয় করতে পারে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। (জামিউত তিরমিযী-২৩৩, রদ্দুল মুহতার ৫/১৪২)

জিজ্ঞাসা-২

কোনো ব্যক্তি দশ হাজার টাকা ঋণ দিয়ে দুই কাঠা জমি বন্ধক রাখে এবং উক্ত জমি থেকে ঋণদাতা কিছুদিন উপকৃত হয়। ঋণ উসুল করার সময় চাষাবাদের কারণে কিছু টাকা কমিয়ে রাখে। এভাবে বন্ধকী জমি থেকে উপকৃত হওয়া সুদের অন্তর্ভুক্ত কি না? হলে সুদমুক্ত হওয়ার উপায় কী?

সমাধান-২

বন্ধকী জমি থেকে উপকৃত হওয়া সুদের নামান্তর বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত জমি বন্ধক নিয়ে তা থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয নেই। কিছু টাকা বাদ দিয়ে হিলা-বাহানা করে জায়েয করা যাবে না। সুদমুক্ত হওয়ার জন্য একটি পন্থা এমন হতে পারে যে, উল্লিখিত জমিকে নির্ধারিত সময়ের জন্য ন্যায্য বিনিময়ে ভাড়া নেবে, নির্ধারিত সময় শেষ হলে জমি ফিরিয়ে দিবে। উক্ত পন্থায় ভাড়া নিলে জমি থেকে উপকৃত হওয়া যাবে, অন্যথায় জায়েয হবে না। (রদ্দুল মুহতার ৬/৪৮২)

প্রসঙ্গ: ঝাড়-ফুঁক

মাও. আনোয়ার হোসাইন
মুক্তাগাছা, মোমেনশাহী।

জিজ্ঞাসা-১

শরীয়তে ঝাড়-ফুঁক-তাবিজ-কবজের কোনো ভিত্তি আছে কিনা? এবং সুস্থতার ক্ষেত্রে এর কোনো নিজস্ব প্রতিক্রিয়া আছে কি না?

সমাধান-১

শরীয়তের আলোকে কুফুরী বা শিরকী কালেমা ব্যতীত অন্য কোনো জায়েয কালাম দ্বারা ঝাড়-ফুঁক বা তাবিজ-কবজ দেওয়ার বৈধতা প্রমাণিত। তবে সুস্থতার ক্ষেত্রে এর কোনো নিজস্ব প্রতিক্রিয়া নেই। বরং সুস্থতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হুকুমেই হয়ে থাকে। (সহীহ বুখারী ২/৮৫৪)

জিজ্ঞাসা-২

ঝাড়-ফুঁক-তাবিজ-কবজের বিনিময় নেওয়া বৈধ আছে কি না?

সমাধান-২

শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে তাবিজ-কবজ দিয়ে তার বিনিময় নেওয়া বৈধ। (আল বাহরুর রায়িক ৬/৩৬৩)

প্রসঙ্গ : বিবাহ

মুহা: জাহাঙ্গীর আলম
ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমার মেয়েকে আমার আপন মামাশ্বশুর বিয়ে করতে ইচ্ছুক। এ ব্যাপারে ইসলামিক আইনে কোনো বিধিনিষেধ আছে কি না?

সমাধান :

কোরআন ও হাদীস তথা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী আপন বোনের মেয়ের মেয়েকে বিবাহ করা হারাম। অতএব আপনার মেয়েকে আপনার আপন মামাশ্বশুরের সাথে বিবাহ দেওয়া বৈধ হবে না। (সূরা নিসা ২৩, রদ্দুল মুহতার ৩/২৮)

প্রসঙ্গ : কুরবানী

মাও. আব্দুর রাজ্জাক
ধনুট, বগুড়া।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের এলাকায় প্রচলিত নিয়ম হলো, বিবাহ অনুষ্ঠানে বর-কনে উভয় পক্ষের মেহমানদেরকে শর্ত করে দাওয়াত

দেওয়া হয়। অর্থাৎ কনের পক্ষ থেকে যদি একশত লোক আসে, বরের পক্ষ থেকেও একশত লোক কনের বাড়িতে যাবে আর যদি দুইশত লোক আসে তাহলে দুইশত লোকই যাবে। এ রকম বিবাহ অনুষ্ঠানে কুরবানীর গোশত দ্বারা মেহমানদারী করানো যাবে কি না? যেহেতু খাওয়ানোটা প্রতিদানস্বরূপ হয়ে থাকে তাই কুরবানীর গোশত প্রতিদানস্বরূপ খাওয়ানো যায় কি না?

সমাধান :

বিবাহ-শাদীতে এ ধরনের শর্ত করে খাওয়া-দাওয়ার প্রচলিত নিয়ম যদিও শরীয়তসম্মত নয়, তবে তাকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিদান বা বিনিময় বলা যায় না। বরং মেহমানদারীতে অবাঞ্ছনীয় শর্তের অনুপ্রবেশ বলা যায় বিধায় এ ধরনের মেহমানদারীতে কুরবানীর গোশত পরিবেশন করা জায়েয হবে। (রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৮, বাদায়িউস সানায়ে ৬/৩২৮)

প্রসঙ্গ : ইজারা, বাঈ

মুহা: আব্দুর রব
মহাখালী, বনানী, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা-১

দুজন দ্বীনদার ব্যক্তি তাদের একজনের অনেক টাকার প্রয়োজন। তার একটি বিল্ডিং/দোকান আছে। সে চাচ্ছে বিল্ডিংয়ের দু'টি ফ্ল্যাট/দোকান দুই বৎসরের অগ্রীম নিয়ে অন্য দ্বীনদার ভাইয়ের নিকট ভাড়া দিতে। কিন্তু অগ্রিম ভাড়া আদায়ের কারণে দুই বৎসরের ভাড়া বর্তমান বাজার মূল্য থেকে কমিয়ে দেবেন। আর দ্বিতীয় ভাই যে ভাড়া নিয়েছেন সে তা তৃতীয় এক ব্যক্তির নিকট মাসিক ভাড়া দেন। বর্তমান বাজার মূল্য হিসেবে অধিক ভাড়া গ্রহণ করা কি দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য জায়েয হবে?

সমাধান-১

প্রথম ভাড়াটিয়ার জন্য অতিরিক্ত মূল্যে ভাড়া দেওয়া জায়েয হলেও অতিরিক্ত টাকা তার জন্য হালাল নয়, বরং তা সদকা করতে হবে। তবে যদি সে অতিরিক্ত মূল্যে অন্য কারো কাছে ফ্ল্যাট-দোকান ভাড়া দিয়ে লভ্যাংশ গ্রহণ করতে চায় তবে এর দুটি পদ্ধতি রয়েছে- (ক) নিজের পক্ষ থেকে সেখানে মেরামত, সাজসজ্জা, রং-চুন বা উন্নয়নমূলক যেকোনো কাজ করে নেওয়া। (খ) ভিন্ন বস্তুর বিনিময়ে ভাড়া দেওয়া। যেমন ধরুন যদি টাকার বিনিময়ে ভাড়া নিয়ে থাকে তবে এর বিপরীত কোনো বস্তু যেমন ডলার ইত্যাদির বিনিময়ে ভাড়া দেওয়া। (আদ্দুররুল মুখতার ২/১৭২, রদ্দুল মুহতার ৮/২৯)

জিজ্ঞাসা-২

বাইবিল ওয়াফা কাকে বলে? একটি দৃষ্টান্তসহ জানতে চাই।

সমাধান-২

বাইবিল ওয়াফা এমন ক্রয়-বিক্রয়কে বলা হয়, যেখানে বিক্রেতার পক্ষ থেকে এই শর্ত করা হয় যে, বিক্রেতা ভবিষ্যতে বিক্রয়লব্ধ টাকা ফেরত দিতে পারলে ক্রেতা পণ্যটি ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। যেমন ফরিদ এক হাজার টাকায় একটি ঘড়ি সাদিকের কাছে এই শর্তে বিক্রয় করল যে, ওই টাকা ফেরত দিতে পারলে সাদিক ঘড়িটি ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। অতঃপর পরবর্তীতে ফরিদ এক হাজার টাকা ফেরত দিতে সক্ষম হলে সাদিকও শর্ত মোতাবেক ঘড়িটি ফেরত দিয়ে দিল। উল্লেখ্য, ক্রয়-বিক্রয়ের সময় পণ্য ফেরত দেওয়ার ওয়াদাবদ্ধ হলে বাইবিল ওয়াফা বৈধ নয় আর পরে হলে বৈধ। (আদ্দুররুল মুখতার ২/৫৭, আল বাহরুর রায়িক ৬/১১)

প্রসঙ্গ: ওয়াকফ

মুহা: ওসমান গণি
বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমার আববা মারা যাওয়ার পূর্বে পারিবারিক কবরের জন্য এক কাঠা জায়গা ক্রয় করেন এবং ওই জায়গাতে তাঁকে দাফন করা হয়। পরবর্তীতে জায়গাটি আমাদের এলাকার মসজিদসংলগ্ন মাদরাসার জন্য ওয়াকফ করা হয়। আমার অন্য দুই ভাই কবরের এক কাঠা জায়গা থেকে তাদের অংশের জায়গা মাদরাসার জন্য ওয়াকফ করে, তাদের ওই দান বা ওয়াকফ শরীয়ত মোতাবেক বৈধ কি না? বর্তমানে স্থানীয় লোকজন এবং মসজিদ ও মাদরাসার কমিটির লোকজন আমার অংশের ওপরে যেখানে আববার কবর রয়েছে। মাদরাসার ছাদ এবং কবরের নিচে বেইজ ঢালাই দিতে চায়। এটা শরীয়তসম্মত হবে কি না?

সমাধান :

কবরের এক কাঠা জায়গা থেকে আপনার দুই ভাইয়ের অংশ মাদরাসার জন্য ওয়াকফ করা সহীহ হয়েছে। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আপনার অংশ যেখানে আপনার আব্বার কবর রয়েছে, উক্ত কবরের নিশানা নিশ্চিহ্ন করে তার ওপর মাদরাসার ছাদ এবং নিচে বেইজ ঢালাই করতে শরয়ীভাবে কোনো সমস্যা নেই। এতে আপনার আববার কবরের কোনো অসম্মানও হবে না। আর যদি অনুমতি না দেন তাহলে মসজিদ-মাদরাসার কমিটির জন্য জোরপূর্বক এ ধরনের কাজ করা জায়েয হবে না। (রদ্দুল মুহতার ২/২৩৩)

প্রসঙ্গ : যিকির

মাও. শেখ নেয়ামতুল্লাহ
হাজীবাড়ী, কুড়িল, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের মসজিদে সাপ্তাহিক হালকায়ে যিকির করা হয় নির্দিষ্ট দিনে। যেমন সোমবার, বৃহস্পতিবার ইত্যাদি। সকলকে দাওয়াত দিয়ে একত্রিত করে উচ্চ আওয়াজে মসজিদে যিকির করা হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, নামাযী ব্যক্তিদের সমস্যা হয়। এভাবে উচ্চ আওয়াজে মসজিদের মধ্যে যিকির নবীজি (সা.) কখনও করেছেন কি? কোরআন-হাদীসের আলোকে সমাধান চাই।

সমাধান :

হাদীসে যেমন উচ্চ আওয়াজে যিকির করার কথা আছে, তেমনি নিচু আওয়াজে যিকির করার কথাও আছে। তবে প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে তথা নির্দিষ্ট দিনে সকলকে অবহিত করে একত্রিত হয়ে মসজিদে উচ্চ আওয়াজে যিকির বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, কোনো নামাযী ব্যক্তির সমস্যা না হওয়া। অন্যথায় তা বৈধ হবে না। উক্ত শর্তের সাথে সম্পৃক্ত বিধায় এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, যাতে করে নামাযী ব্যক্তি একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করতে পারে এবং যিকিরকারীও যিকির করতে পারে। (সূরা আ'রাফ ২০৫, বুখারী ১৩/৩৮৪)

প্রসঙ্গ : মাদরাসা

মাও. মফিজুল্লাহ
দৌলতখান, ভোলা।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের দক্ষিণাঞ্চলে বর্তমানে 'কুয়েত সংস্থা' নামের একটি দাতা সংস্থা বিভিন্ন মসজিদ-মাদরাসায় অনুদান প্রদান এবং অনেক ক্ষেত্রে পুনর্নির্মাণও করে দেয়। এই সংস্থার নিয়ম এই যে, মাদরাসায় অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে ছাত্রসংখ্যা দেখে থাকে। তাই অনুদান পাওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন মাদরাসার কর্তৃপক্ষগণ নিজ মাদরাসায় ছাত্র কম হওয়ার দরুন অন্য মাদরাসা থেকে ছাত্র নিয়ে আসে এবং ওই ছাত্রদেরকে উক্ত সংস্থার নিকট নিজ মাদরাসার ছাত্র হিসেবে পরিচয় দেয়। এখন আমার জানার বিষয় এই যে, বর্ণিত কৌশলের মাধ্যমে মাদরাসা কর্তৃপক্ষের জন্য উক্ত সংস্থা থেকে অনুদান গ্রহণ করা জায়েয আছে কি না?

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত কৌশলের মাধ্যমে মাদরাসার কর্তৃপক্ষের জন্য উক্ত সংস্থা থেকে অনুদান গ্রহণ করা জায়েয হয়নি। কেননা এটা সম্পূর্ণ ধোঁকাবাজি আর ধোঁকাবাজি করে অনুদান গ্রহণ করা শরীয়তে বৈধ নয়। (মুসলিম ১/৭০, রদ্দুল মুহতার ৫/৪৭)

প্রসঙ্গ : কুরবানী

মাও. মাহমুদুল হাসান
দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।

জিজ্ঞাসা :

কুরবানী করার জন্য ছয়জন মিলে একটি জন্তু ক্রয় করল। এ ক্ষেত্রে সপ্তমাংশ সকলে মিলে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য কুরবানী করতে পারবে কি না?

সমাধান :

প্রশ্নোক্ত মাসআলায় সপ্তমাংশের কুরবানী সহীহ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে মুফতিয়ানে কেরামের মতপার্থক্য থাকায় সতর্কতামূলক ছয়জনের যেকোনো একজনকে সপ্তমাংশের মালিক বানিয়ে দিয়ে তার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামে কুরবানী করাই শ্রেয়। (রদ্দুল মুহতার ৬/৩১৬, জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া ৩/৪২০)

প্রসঙ্গ : চুল বিক্রি

মুহা: ওমর ফারুক
দিনাজপুর।

জিজ্ঞাসা :

মহিলাদের চুল দ্বারা কসমেটিকসের দোকান থেকে পণ্য ক্রয় করা যাবে কি না?

সমাধান:

মহিলাদের চুল দ্বারা পণ্য ক্রয় করা জায়েয নেই। (সুরা বনী ইসরাঈল ৭০, রদ্দুল মুহতার ৫/৫৮)

প্রসঙ্গ : জানাযা

মুহা: আরিফ রব্বানী
দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর।

জিজ্ঞাসা :

জানাযার নামাযে তাকবীর কয়টি? এবং জানাযার নামাযের সুন্নাত তরীকা কী?

সমাধান :

জানাযার নামাযের তাকবীর চারটি এবং জানাযা নামাযের সুন্নাত তরীকা হচ্ছে জানাযার নিয়্যতে প্রথম তাকবীর বলে কান পর্যন্ত উভয় হাত উঠিয়ে নাভির নিচে বাঁধার পর ছানা পড়বে। অতপর ওই অবস্থায় দ্বিতীয় তাকবীর বলে দরুদ শরীফ পড়বে। তারপর তৃতীয় তাকবীর বলে মাইয়াতের জন্য দু'আ পড়বে। ইমাম তাকবীর ছাড়া এবং মুক্তাদী তাকবীরসহ সকল দু'আ নিঃশব্দে পড়বে। অতঃপর চতুর্থ তাকবীর বলে উভয় দিকে সালাম ফেরাবে। (বুখারী ১/১৭৮, শরহে মা'আনীল আসার ১/৩১৯)

মলফূজাতে আকাবের

আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন

*** দুনিয়ার দৃষ্টান্ত**

শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) বলেছেন, দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হলো সাপের ন্যায়। যে মন্ত্র জানে, সেই তা ধরতে পারবে। যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম তাকে ধরার মন্ত্র জানতেন তাই দুনিয়া অর্জন তাঁদের জন্য ক্ষতিকর ছিল না। আমাদের যেহেতু মন্ত্র জানা নেই, তাই এর থেকে আমাদের দূরে থকতে হবে। যেন দংশন করতে না পারে। দুনিয়া হলো পরীক্ষার জায়গা এবং পেরেশানির জায়গা, তাই সেখানে বসবাস করতে হলে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ সামান্য গাফেল হলেই সে হামলা করে বসবে। সেজন্য সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দু'আ করতে হবে এবং দুনিয়া থেকে ভয়ে থাকবে। এবং দ্বীনের কাজে লেগে থাকবে। মৃত্যু পর্যন্ত সেই প্রচেষ্টায় থাকবে। কেননা এটি এমন বিষয়, যা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনো সময় অবসর গ্রহণের আশা করা বোকামি বৈ কিছুই নয়। (আহলে দিল কে আনমূল আক্বওয়াল ৪৭)

*** সূলূকের ভিত্তি**

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) বলেন, সূলূকের ভিত্তি হলো নফ্সকে তার চাহিদা পূরণ থেকে বিরত রাখা, যার মধ্যে গুনাহের কাজ থেকে একেবারে বিরত থাকা অপরিহার্য। এবং মুবাহ কাজসমূহ ও কমিয়ে ফেলা জরুরি। (কামালাতে আশরাফিয়্যাহ)

*** অহংকারের ভিত্তি**

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকূব নানূতবী (রহ.) বলতেন, অহঙ্কারের ভিত্তি অজ্ঞতা, অর্থাৎ সাধারণত অজ্ঞ মানুষই অহংকার করে। হাকীমূল উম্মত থানভী (রহ.) বলেন এ স্থানে অজ্ঞতা থেকে উদ্দেশ্য বোকামি অর্থাৎ বোকামির কারণেই মানুষ অহংকার করে। (আহলে দিল কে আনমূল আক্বওয়াল ৯৩)

*** খোদাপ্রেমিকের দৃষ্টান্ত**

হাকীমুল উম্মত মাওলানা থানভী (রহ.) বলেন, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানূতভী (রহ.)-এর চলাফেরা সাধারণ আলেমের মতোও ছিল না, দরবেশের মতও ছিল না। বরং তাঁর চলাফেরা ছিল খোদাপ্রেমিকের মতো। এবং তাঁর মজলিস ছিল দোস্তগণের মজলিসের মতো। সাধারণত মোটা কাপড় পরিধান করতেন। একদা এক তাঁতি তাঁর সাধাসিধে চলাফেরা দেখে নিজের মতো তাঁতি মনে করে দেওবন্দ থেকে নানূতাহ যাওয়ার পথে জিজ্ঞেস করলেন, ''আজ সুতার মূল্য কত? তিনি খুবই বিনয়ের সহিত উত্তর দিলেন, ভাই, আজ বাজারে যাওয়া হয়নি।'' (আকাবির ওলামায়ে দেওবন্দ ১৭)

*** সুবর্ণ সুযোগ**

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, অবসর সময়কে নামাযের ফজীলত অর্জনের জন্য সুবর্ণ সুযোগ মনে করো, হতে পারে তোমার মৃত্যু হঠাৎ এসে যাবে। অনেক সুস্থ ও সবল লোককে দেখেছি হঠাৎ তারা মৃত্যুর কবলে পতিত হয়ে গেছে। (ইযাহুল বুখারী)

*** পরস্পর ভালোবাসা সৃষ্টির উপকরণ**

মাওলানা মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী (রহ.) বলেন, মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর ভালোবাসা সৃষ্টির উপকরণসমূহ নিম্নরূপ

(১) তাকওয়া তথা গুনাহ থেকে বাঁচার প্রচেষ্টা করা। (২) গুনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে তাওবা করা। (৩) আল্লাহ্ ওয়ালাদের সংশ্রবের মাধ্যমে অথবা তাদের মলফূযাত এবং মউতের মুরাকাবার মাধ্যমে (حب مال) তথা সম্পদপ্রীতি ও (حب جاه) তথা যশখ্যাতির মোহের চিকিৎসা করা। (৪) একে অপরের কথা কাজ ও জিনিসের প্রশংসা করা এবং অনুপস্থিতিতে একে অপরের প্রশংসা করা। (৫) পরস্পরে বাহ্যিকভাবে হলেও মুহাব্বত প্রকাশ করা। (৬) সম্মিলিত কাজে সবার চেয়ে কাজে অংশ বেশি নেওয়া এবং অন্যের খেদমতের চেষ্টা করা। (৭) প্রত্যেক বিষয়ে অপরকে প্রাধান্য দেওয়া। (৮) যদি কারো ব্যাপারে কোনো আপত্তি আসে তাহলে তা অন্তরে না রেখে বিনয় এবং মুহাব্বতের সাথে তাকে বলে দেওয়া। (৯) একে অপরের জন্য দু'আ করা। (১০) আল্লাহ পাকের নিকট পরস্পর মুহাব্বত সৃষ্টি হওয়ার জন্য দু'আ করা এবং অনৈক্যের আযাব থেকে পানাহ চাওয়া। (আহসানুল ফাতাওয়া ১/১৪)

*** যিকিরের ফায়েদা**

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহ.) বলেন, যা কিছু আল্লাহ পাক যিকির ফিকিরের তাওফীক দান করেন করতে থাক। সাহস হারাবো, যদিও অন্তরে কোনো ক্রিয়া না করে। যবানে যিকির করতে পারা কি অল্প ফায়দার কাজ? যবান যখন যিকিরের কারণে জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে যাবে, অন্তর ও বেঁচে যাবে। (তালীফাতে রশীদিয়্যাহ)

*** আল্লাহ্র ওলী কে?**

আল্লামা আবুল কাসেম কুশাইরী (রহ.) বলেন, আল্লাহর ওলী সে ব্যক্তি যে সততার সাথে আল্লাহ পাকের হক আদায় করে এবং মানুষ তাঁর থেকে দু'আ আবেদন করার অপেক্ষা না করে তাদের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে দু'আ করতে থাকে এবং কারো থেকে প্রতিশোধ নেয় না মাখলূক থেকে কিছু পাওয়ার আশা রাখে না। নিজের স্বার্থে কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করে না। (রুহ কী বীমারিয়া আওর উনকা এলাজ ১৬৪)

AL MARWAH OVERSEAS
recruting agent licence no-rl156
ROYAL AIR SERVICE SYSTEM
hajj, umrah, IATA approved travel agent
হজ, ওমরাসহ বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং ও সকল এয়ারলাইন্স টিকেটিং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অল্পখরচে দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।
Shama Complex (6th Floor)
66/A Naya Paltan, V.I.P Road
(Opposite of Paltan Thana East Side of City Haeart Market)
Dhaka: 1000, Bangladesh.
Phone: 9361777, 9333654, 8350814
Fax 88-02-9338465
Cell: 01711-520547
E-mail: rass@dhaka.net

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সর্বপ্রকার বাতিলের মোকাবেলায় এগিয়ে যাবে
“আল-আবরার” এই কামনায়
জনপ্রিয় ১৯৩৭ সাবান
প্রস্তুতকারক
হাজী নুরআলী সওদাগর এন্ড সন্স লিঃ
চাক্তাই, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
ফোন : বিক্রয় কেন্দ্র : -০৩১-৬৩৪৯০৫, অফিস: ০৩১-৬৩২৪৯৩, ৬৩৪৭৮৩